নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

আচার বিচার সংস্কার

আচার বিচার সংস্কার

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

আচার-বিচার-সংস্কার

আচার-বিচার-সংস্কার

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

অভিযান পাবলিশার্স

আরম্ভে কর্মণাং বিপ্রঃ

এই বইটা লেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না, আজকের দিনে আচার-বিচার বড়ো অশ্রদ্ধেয় কথা। তবু এক সময় এই লেখাটা লিখেছিলাম এবং তা কখনওই এই কারণে নয় যে, নবমীতে লাউ খাওয়া নিয়ে আমার বড়ো চিন্তা আছে, কিংবা একাদশী ব্রত পালন করে কোনো মধুর স্বর্গে অক্ষয় গতি নিয়েও বড়ো ভাবনা আছে আমার। এই প্রবন্ধ লেখার পিছনে আমার যে সামান্য ভাবনাটুকু ছিল, তা একেবারেই আমাদের সামাজিক ব্যবহারের নিদান খুঁজে বার করা। বিশেষত আজও অন্নপ্রাশন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধকার্যও হচ্ছে। আমি ভাবলাম — এগুলো নিয়েই আমি বেশি আলোচনা করব এবং তা একটু বিশদভাবেই করব। সেই বড়ো একটা প্রবন্ধের পরিসর চিন্তা করার পর আমার হাতে এই পর্বতের মূষিক-প্রসব ঘটল। আসলে তখন আনন্দবাজারের পুজোসংখ্যার তাড়না তৈরি হচ্ছিল, সেখানে জায়গা এত ছিল না যে, লেখাটিকে গবেষক-জনোচিত গম্ভীর বিস্তারে সাজিয়ে দেব। ভেবেছিলাম, পরে পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করব, কিন্তু জীবনের চলার পথটা এই বৃদ্ধত্বের

মুখেই এত জটিল এবং সমান্তরাল কর্মে ব্যাপৃত হয়ে উঠেছে যে, কিছু আর করা গেল না। না পরিমার্জন, না পরিবর্ধন।

তবু জানিয়ে রাখি, ইচ্ছেটা এখনও চলে যায়নি। কেননা মানুষের এই প্রাচীন বিশ্বাসগুলি শুধুমাত্র কতগুলি বিচ্ছিন্ন কুসংস্কারের ওপর গড়ে ওঠেনি। এগুলোর মধ্যে আমি কোনো 'সায়েন্স' খুঁজতে যাব না, কিন্তু এই সংস্কারগুলির পিছনে এমন কিছু যুক্তি আছে, যেগুলি আমাদের সভ্যতার 'উর্ধ্বমূল অধঃশাখ' বটবৃক্ষটির একটা অন্যতর বিশ্লেষণ তৈরি করে। আমি হয়তো সময় পেলেই আবারও বসব প্রাবন্ধিকের তপস্যায়। অনেক কিছু আমার মধ্যে তৈরি হয়েই আছে, যেগুলি এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থিত করতে পারলাম না। ভবিষ্যতে বর্তমান প্রকাশক যদি অতিগম্ভীর না হয়ে ওঠেন, তাহলে বর্তমান লেখাটিকে আপনাদের মনোগ্রাহ্য করে সাজিয়ে দিতে পারব। আমার সহৃদয় পাঠকুলের অনন্ত কৃপা আমার ওপর আছে, তাদের ইচ্ছে থাকলে হয়তো আমারও ইচ্ছে তীব্রতর হবে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি আমাকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একটা বিদ্বৎসভায় পড়তে হয়েছিল। দর্শন-বিভাগের সেই বক্তৃতায় পূর্ব প্রবন্ধের কিছু কথা পুনরাবৃত্তও হয়েছে, আমি সেটাকেও পূর্ব-প্রবন্ধের সঙ্গে সংগ্রন্থিত করতে পারিনি। এত অক্ষমতা সত্ত্বেও অভিযান পাবলিশার্সের মারুফ আমার অক্ষমতার দায় নিজে গ্রহণ করে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করছে। ঈশ্বর ওরও মঙ্গল করুন, আমারও মঙ্গল বিধান করুন। আমার লেখা প্রকাশনার ব্যাপারে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা এবং ছাত্রপ্রতিমেরা অনেক সাহায্য করে। তাদের মধ্যে অধ্যাপিকা তাপসী মুখোপাধ্যায়, সীমান্ত গুহঠাকুরতা, সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলোমা মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের মধ্যে আমার স্ত্রীও অনেক সাহায্য করেছেন। এদের সকলের সুস্থ জীবন কামনা করি।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

আমার আচার-প্রিয়

প্রগতিবাদী

পিতা-ঠাকুরের উদ্দেশে

প্রণামান্তে

আচার-বিচার-সংস্কার

আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে, একবিংশ শতাব্দীর সু-উন্নত, যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত সুখস্পর্শ পেতে পেতে সত্যিই এই লেখায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার উচিত ছিল না। সত্যিকথা বলতে কী, মূর্খ বা পণ্ডিত কোনো ব্যক্তিকে আলোচ্য এই সংস্কারগুলির প্রতি সশ্রদ্ধ হওয়ার জন্য বা তাতে প্রবৃত্ত করার জন্যও এই প্রবন্ধের উদ্যোগ নয়। তবে অকারণে কার্যপ্রবৃত্তি ঘটে না বলে এই লেখার উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। অবশ্য তার জন্য কোনো প্রাবন্ধিক ভূমিকা বাদ দিয়ে আমি সামান্য দু-একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করতে চাই।

মার্কিন দেশস্থ এক প্রবাসী পুত্রের পিতা — নিজেও বহুকাল ও-দেশেই ছিলেন এবং কার্যসূত্রে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক — আমাকে এসে বললেন — আমার ছেলেটি এক মার্কিন-রমণীকে বিয়ে করেছে। দুজনের মধ্যে রফা হয়েছে — আমার পুত্র একবার চার্চে যাবে এবং খ্রিস্ট্রীয় মতে চার্চে বিয়েও করবে। আবার অন্য দিকে সে ভারতীয় মতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেও কিছু অনুষ্ঠান করতে চায়। মেয়েটি তা মেনে নিতে রাজি। আপনি দু-চারটি মন্ত্র আমাকে বলুন এবং তার মানেও বলুন। তবে হ্যাঁ মশাই, আপনি তেমন কোনো মন্ত্রের কথা বলবেন না, যাতে স্ত্রীলোকের

বা কন্যাপক্ষীয়দের কোনো মানহানি ঘটে; আসলে আমাদের পুত্রবধূটি ভারতীয় ভাবধারায় বিবাহে খুব আগ্রহী। কাজেই আমাদের প্রাচীনপ্রথাগুলি যাতে লজ্জাজনকভাবে উপস্থাপিত না হয়, সেটা আমাদের দেখতে হবে।

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম — আমাদের প্রাচীন বৈবাহিক-প্রথার মধ্যে আপনি মানহানি ঘটানোর মতো কী দেখলেন, আর লজ্জাজনকই বা কী আছে? ভদ্রলোক বললেন — ওই যে আছে না, বিয়ের সময় মেয়ের বাবা হবু জামাইয়ের হাঁটুতে হাত রেখে — ওটাকে পায়ে ধরাই বলে মশাই — তারপর বলেন, আমার মেয়েকে যাবজ্জীবন সুখে রেখো, বাবা! তা ওটা কি ঠিক হল মশাই? মেয়ে কিংবা মেয়ের বাবার কোনো ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নেই? নাকি তাঁরা বর-পক্ষের কাছে বিকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে? আমি তাই বলি, এ-সব অংশ বাদ দিয়ে আপনি ভালো ভালো কিছু বেদ-মন্ত্র আমাকে বলুন, যেগুলো আমি আগেও শুনেছি। সেগুলো বেশ রোমান্টিক মশাই!

আমি প্রতিবাদ করলাম না। আবার করলামও। বললাম — আপনি যে অপমানের উদাহরণটা দিলেন, সেই উদাহরণটা আপনার আগে আরো অন্তত পাঁচজন দিয়েছেন। তার মধ্যে নামী-দামি চিত্রতারকাও যেমন আছেন তেমনি আছেন অতিপ্রগতিশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা এবং তিনি ভালোরকম সংস্কৃত জানেন। তবু প্রগতিশীল হতে হবে বলেই সাধারণ্যে তিনি এইভাবেই প্রচার করেন। আর আপনি যে বললেন — বেদের মন্ত্রগুলি খুব রোমান্টিক। তা রোমান্টিকতা খুঁজলে ওই হাঁটু-ধরার মন্ত্রেও আপনি রোমান্টিকতা খুঁজে পাবেন। ভদ্রলোক বললেন — সেটাও তো আপনি নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন। আমি বললাম — বটেই তো। ব্যাখ্যাই তো সব মশাই। ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তো বিশেষ বস্তুর প্রতিপত্তি হয়, আপনি কিংবা সেই প্রগতিশীলা অধ্যাপিকা বলছেন বলেই অথবা সন্দেহ করছেন বলেই তো বস্তুর অলক্ষণ প্রমাণিত হয় না অথবা বস্তুর অন্যথা-লক্ষণও প্রতিপাদিত হয় না।

অলক্ষণ, অন্যথা-লক্ষণ ইত্যাদি শব্দ শুনে ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে

গেলেন। তর্কের সুযোগ বুঝে আমি বললাম — আচ্ছা, শ্রাদ্ধের সময়ে আপনি বৃষোৎসর্গের মন্ত্র শুনেছেন কখনো? ভদ্রলোক নেতিবাচক মাথা নাড়লে আমি বললাম — শ্রাদ্ধকালে বৃষোৎসর্গের সময় যে বামুন-পুরোহিতের উদ্দেশ্যে এই দান করা হয় তাকে আসনে বসিয়ে সম্মান করার সময় যে মন্ত্র পড়া হয়, কন্যা-পিতা হবু জামাইয়ের উদ্দেশ্যেও ওই একই মন্ত্র পড়েন। ব্যাপারটা বুঝলেন কিছু? ভদ্রলোক বললেন — আপনি তো শ্রাদ্ধের বামুন আর বিয়ের জামাইকে এক করে দিলেন, এক করে দিলেন দাতব্য বৃষ আর দাতব্যা কন্যাকেও। আমি বললুম — ঠিক এমন তর্কই প্রাজ্ঞমানিনীরাও করেন। কিন্তু আসল কথা কী জানেন, মন্ত্রকর্তাদের দৃষ্টিটা বামুন আর জামাইয়ের একত্ববোধনে নয় অথবা নয় বৃষ এবং কন্যার একত্ব-প্রতিপাদনে। একত্বটা কোথায় জানেন? একত্বটা হল দানের মর্মঘোষণার মধ্যে। কন্যা-পিতা কন্যাদান করছেন, মৃতপিতৃক পুত্র বামুনকে গোরু দান করছেন — দুই ঘটনার পাত্র পৃথক, পরিবেশ পৃথক, দাতব্য বস্তুও পৃথক। কিন্তু দুটি ঘটনার একত্ব বা মিল কোথায়? দানের মধ্যে। সেকালের দিনের দানক্রিয়ার মর্যাদা আর মর্ম বুঝলেই আপনার এই মন্ত্রের প্রতি বিরূপতা থাকবে না।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে অধিকতর শুশ্রূষু হলেন। আমি বললাম — আপনি দান কিংবা সম্প্রদান মানে জানেন? বললেন — কেন জানব না! আমার এতটা আছে গরিব-দুঃখীকে একটু দিলাম — এই আর কী। আমি বললুম — আমার মুখ্যু ঠাকুমা-দিদিমাও যা বুঝতেন, আপনি অধ্যাপক হয়েও তা বোঝেননি। তিনি বললেন — কী রকম, কী রকম? বললাম — খেয়াল করে দেখুন। তাঁরা যখন ভিক্ষা দিতেন, তখন ছোট্ট থালায় বা বাটিতে দু-মুষ্টি চাল সাজাতেন, এই চালের ওপরে একটি আলু অথবা একটু আনাজ। তারপর সেই বাটি বা থালা সযত্নে ডান হাতে ধরে বাঁ হাতটি ডান হাতের ডানায় ঠেকিয়ে — যেন দুহাতে দিচ্ছেন এইভাবে — ভিখারির ঝোলায় উপুড় করে দিতেন। দানপ্রাপ্ত ভিখারি কপালে হাত ঠেকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালে, দাত্রী মহিলাও কপালে হাত ঠেকিয়ে নিজের

আত্মগরিমা লঘু করে দিতেন। এখন যদি বলেন — আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা ভিখারির উদ্দেশ্যে প্রতিনমস্কার জানিয়ে আমাদের মর্যাদা নষ্ট করেছেন, তাতে যুক্তির বাধা হবে কিছু?

ভদ্রলোক কেমন যেন একটু চুপ করে গেলেন। আমি বললুম — যে ভাবে যে কেতায় এই সামান্য দানটুকু সম্পন্ন হত, তার একটা পরম্পরা আছে এবং সেই পরম্পরা নেমে আসছে উপনিষদের কাল থেকে, অথচ আমাদের মা-ঠাকুমারা যে জীবনে উপনিষদ পড়েছেন বা বুঝেছেন তা কিন্তু নয়। কিন্তু পরম্পরাক্রমে সে বিদ্যা তাঁদের আত্মস্থ হয়েছিল। কেমন করে হয়েছিল তাও বলি। দান করতে হবে কী ভাবে, তার সবচেয়ে পুরনো প্রথাটি বলেছে তৈত্তিরীয় উপনিষদ। বলেছে — শ্রিয়া দেয়ম্ — শ্রী মানে বাংলায় অপভ্রংশে ছিরি অর্থাৎ দান করার মধ্যে যেন ছিরি-ছাঁদ থাকে। ফেলিয়ে-ছড়িয়ে, ছুঁড়ে ফেলে নয়, সেই দানের মধ্যে যেন সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, দানের মাধ্যমে যেন মর্যাদা ফুটে ওঠে। আরও কী ভাবে? তৈত্তিরীয় বলেছে — হ্রিয়া দেয়ম্ — হ্রী মানে লজ্জা। দানের মধ্যে যেন লজ্জা থাকে। অর্থাৎ দিচ্ছি বলে যেন কোনো ঔদ্ধত্য তৈরি না হয়। নিজের অহমিকা এবং আত্মসচেতনতা নিজেই লাঘব করে দান করতে হবে। তৃতীয় কথা — শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ — শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে। দান-গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে দিতে হবে। আর যদি অশ্রদ্ধা থাকে, তবে উপনিষদ পরিষ্কার নিষেধ করে দিয়েছে — অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ — অর্থাৎ শ্রদ্ধা না থাকলে দিও না, সেও অনেক ভালো, কিন্তু দিতে যদি হয়, তবে ওই সৌন্দর্য, অহমিকাহীনতা এবং শ্রদ্ধা এই তিনটিই থাকা দরকার।

দেখুন, উপনিষদের এই শ্রী, হ্রী এবং শ্রদ্ধা — এই তিনটিই যেমন আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের সামান্য তণ্ডুল-দানের মধ্যেও পরম্পরাক্রমে আপনিই নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেটা যে কন্যাদান অথবা শ্রাদ্ধকালীন কোনো দানে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে, এইটাই তো স্বাভাবিক। লক্ষ্য করে দেখুন, ব্যাকরণ বা নৈয়ায়িকদের ভাষ্যে দান কাকে বলে? দান হল নিজের স্বত্ব বা অধিকার নষ্ট করে অন্যের স্বত্ব বা অধিকার উৎপাদন

করা। আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা দানের মর্ম এইভাবে বুঝতেন বলেই যাকে তাঁরা কন্যাদান করতেন — তাঁকে আগে আসনে বসাতেন দেবতার মতো। বাড়িতে ঠাকুরপুজো হলে — ঠাকুরকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য অর্থাৎ পা ধোয়ার জল, খাবার জন্য ফল দিতে হয়। খাবার পরে আচমন, বস্ত্রালংকার এবং তাম্বুল নিবেদন করতে হয়। সশ্রদ্ধ ব্যক্তির এই আচরণে কী হয়? দেবতার তুষ্টি উৎপাদন হয়। এই তুষ্টি উৎপাদনের প্রয়োজন কী? দেবতার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ ব্যক্তি দান-মান দেবেন, তার জন্য পূর্বাহ্ণেই তাকে প্রস্তুত করা — এই প্রয়োজন।

এই আচার জামাইয়ের ক্ষেত্রেও, যেখানে কন্যাদানের প্রস্তুতি হিসেবে কন্যা-পিতা দান-গ্রহীতাকে মান দেন আগে। ওই একই আচার সেই বামুনের ক্ষেত্রেও, যেখানে মৃতপিতৃক পুত্র শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করার জন্য দানগ্রহীতা বামুনকে মান দেন। দানের পূর্বে এই মান এবং তুষ্টিসাধনের মধ্যে কী পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে দানের মণ্ডন, অলংকরণ — শ্রী, হ্রী, শ্রদ্ধা। এখানে তার চেহারা কেমন? একই চেহারা কন্যাদান এবং বৃষোৎসর্গে। যেমন কন্যাদাতা পিতা হবু-জামাইকে বরাসনে বসিয়ে প্রথমে সংস্কৃতে বলেন — আপনি ভালো করে বসুন। জামাই বলেন — ভালো করেই বসেছি — সাধু অহম্ আসে। কন্যাদাতা বলবেন — আপনাকে যথাবিধি অর্চনা করতে চাই। জামাই বললেন — করুন অর্চনা — ওঁ অর্চয়। এবারে সেই পাদ্য-অর্ঘ্য, ফল-মূল, মাল্য, বস্ত্র অলংকার তাম্বুল দিয়ে জামাইকে বরণ করবেন কন্যার পিতা। কন্যা দান করার আগে কন্যার পিতা এবার নতুন বরের জানু-দেশে হাত দিয়ে রেখে কন্যার ব্যাপারে নিজের অহমিকা, অধিকার, স্বত্ব বিসর্জন দিয়ে সলজ্জ শ্রীময়তায় একান্ত আপন কন্যার ওপর নবাগত পুরুষের স্বত্ব উৎপাদন করে বলেন — এই দান গ্রহণের জন্য আপনার যথোচিত অর্চনা করে আপনাকে বর হিসাবে বরণ করছি — শুভ-বিবাহায় দাতুম্ এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য বরত্বেন ভবন্তম্ অহং বৃণে। দাতার সলজ্জ অভিভাষণ শুনে বরও তখন সলজ্জে বলেন — আমি বরণ স্বীকার করলাম — ওঁ বৃতো'স্মি। কন্যাদাতা এই প্রতিজ্ঞাত মুহূর্তে

আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসেন সঙ্গে সঙ্গে। মুখে বলেন — তাহলে এ বার বিবাহ-কর্ম শুরু করতো। বর বলেন — আমার জ্ঞান অনুসারে সেই চেষ্টা করছি — ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি। বাস! বিবাহের আঙ্গিক এবার শুরু হল।

এতক্ষণ একনাগাড়ে বলার পর আমার একটু সংকোচ হল। ভদ্রলোককে বললাম — কী বুঝলেন? দেখলাম ভদ্রলোকটি আর বেশি কথা বললেন না। শুধু বললেন — এ ভাবে ব্যাখ্যা করলে অবশ্য ঠিক পায়ে ধরে বিয়ে দেওয়ার মতো কিছু বোঝায় না বটে। তবে এখনকার দিনে এভাবে কেউ বুঝবে বলেও মনে হয় না। আমি বললাম — একেবারে ঠিক কথা। এভাবে কেউ বুঝবে না, আর শত-শত মানুষকে বুঝিয়ে এটা সপ্রমাণ করার গুরু দায়িত্বও আমার ওপর কেউ ন্যস্ত করেন নি। তবে একটা কথা — আধুনিক দৃষ্টিতে এগুলিকে আপনারা সংস্কার বলতে পারেন, কুসংস্কার বলতে পারেন, এমনকী এগুলি মানবারও কোনো প্রয়োজন নেই — কারণ এগুলি না মেনেও সহস্রেক মানুষ সুখে শান্তিতে দাম্পত্য জীবনযাপন করছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হল, আপনার বিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত এবং তথাকথিত প্রগতিশীল চেতনা দিয়ে এখনকার সমাজের যুক্তিবুদ্ধি এবং কূট তর্কগুলি তখনকার সমাজের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। আমাদের পূর্ব-পিতামহ পূর্বজরা যে বিচারে এবং যে বুদ্ধিতে এক একটি সংস্কার মেনেছেন, সেটা তাঁদের সমাজের ভাবনা, আচার এবং মানসলোকেই নিহিত। অতএব সেটাকে বুঝতে হবে খানিকটা প্রাচীন বৃদ্ধের প্রতি সমবেদনার দৃষ্টি নিয়ে এবং তাঁদের ভাবনালোক মাথায় রেখেই। তা নাহলে পদে পদে অবিচার ঘটবে প্রাচীন সেই পিতামহের ওপর — যে পিতামহ পক্ককেশে পক্কশ্মশ্রুতে হাত বুলাতে বুলাতে সহাস্যে এই অত্যাধুনিক বর্তমান কালের নাতিটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, আর মাঝে মাঝেই বলছেন — আমাদের কালে এ-সব অন্যরকম ছিল বাপু। তোমরা যতই দোষ ধরো, আমাদের কালই ভালো ছিল। আপনি কি এই বৃদ্ধের ওপর রাগ করতে পারেন?

আমাদের আরও কিছু যুক্তি-তর্ক আছে এই প্রবন্ধের পূর্বান্বয় বোঝাবার জন্য। বোধহয়, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ নেই, যেখানে তিন হাজার বছর আগের কোনো বিবাহ-সময়ে যে মন্ত্র পড়া হত, এখনও সেই মন্ত্রই পড়া হয় বিয়ের সময়। মন্ত্রের মানে নাই বুঝলাম, তাৎপর্য নাই বুঝলাম, মন্ত্রের বিনিয়োগ-উপযোগও না হয় নাই বুঝলাম, তবু হাজার হাজার মানুষ এখনও সেই মন্ত্র-সহযোগে বিবাহ করেন। পুরোহিত মন্ত্র বলেন, আমরাও বলি। মন্ত্রে বিশ্বাস নাই থাকুক, তবু মন্ত্রটা বলা চাই। একইভাবে দেখুন, একটি বাচ্চার ছয়-কি-সাত মাস বয়স হল আর অমনি আমরা ধুম-ধাম মন্ত্র-পুরোহিত সহযোগে মুখে-ভাত বা অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করি। বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীলদের অজস্র গালাগালি সত্ত্বেও এখনও হাজার হাজার বাড়িতে উপনয়নের ব্যবস্থা হয়। আর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এখনও সর্বজনীন। আমি অনেক তথাকথিত প্রগতিশীলদের মৌখিক বাগাড়ম্বর শুনেছি, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই আচরণহীন মৌখিকতা। সময়মতো অভিনব উপায়ে জাত মিলিয়ে বিয়ে করা এবং মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধ করা — এ দুটোই তাঁরা অনেক সময়েই করে থাকেন, অবশ্য তার জন্যও তাঁদের সুযুক্তি-কুযুক্তির অভাব হয় না।

আমার শুধু জিজ্ঞাস্য হয় — এই যে, এখনও তিনটি-চারটি বৃহত্তর সংস্কার আমরা সামাজিক জীবনে মেনে চলি — এর পিছনে যুক্তি-বুদ্ধি অথবা অনেক ক্ষেত্রে প্রগাঢ় কোনো বিশ্বাসও যে আছে — তা আমার মনে হয় না। তবে যেটা আছে, সেটা হল চিরন্তন সংস্কার, পিতৃ-পিতামহক্রমে নেমে আসা কতগুলি অভ্যস্ত রীতি-নীতি-পদ্ধতি। তার মধ্যে পারলৌকিক মাহাত্ম্যের বোধ এতটুকুও বোধহয় এখন অবশিষ্ট নেই, তবে যে মাহাত্ম্যটুকু আছে তা এক সুবিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষের ঝুরির মতো আমাদের বর্তমান সমাজের এখানে ওখানে প্রোথিত হয়ে রয়েছে। আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলে এই সংস্কারগুলির কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য এখন খুব বড় হয়ে ওঠে না, কিন্তু সংস্কারগুলি যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এখন সামাজিক উৎসবের চিহ্নে রূপান্তরিত, তাই সেই সেগুলির সামাজিক

তাৎপর্য আছে বটে, কিন্তু সাংস্কারিক তাৎপর্য একেবারেই হারিয়ে গেছে।

কিন্তু আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেই সাংস্কারিক তাৎপর্যের উজ্জাগরণ মোটেই নয়, বরঞ্চ এ হল এক অন্বেষণ — যে অন্বেষণ আমাদের অতিপ্রাচীন পিতামহদের একান্ত আপন ভাবনা লোকে নিয়ে যাবে সকলকে, অথবা এই অন্বেষণ আমাদের বুঝিয়ে দেবে — আমরা আজকে যা আচরণ করছি অথবা যা করছি না — তা আসলে মূলে কী ছিল এবং কোন্ সমাজ-চেতনার মধ্যে সেই সংস্কারগুলি তৈরি হয়েছিল। আরও বুঝিয়ে দেবে — আমাদের সেকালের পিতামহরা যে সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মকে জীবনের অঙ্গ বলে ভাবতেন, তার অনেকগুলিই কেন কালের যাত্রাপথে মাঝখানেই স্তব্ধ হয়ে গেল, আর কেনই বা মাত্র তিনটি-চারটি ক্রিয়াকর্ম এমনভাবে দৃঢ়-প্রোথিত হয়ে রইল যা আজও একভাবে বা অন্যভাবে আমরা মেনে নিই, অথবা না মানতে পারলে অস্বস্তি বোধ করি।

প্রথম কথাটি হল — এই যে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি — হয়তো এই তিনটি মুখ্য শব্দের সঙ্গেই আপনারা সুপরিচিত এবং অন্য ক্রিয়াকর্মগুলি যেমন গর্ভাধান, চূড়াকরণ ইত্যাদির সম্যক পরিচয় আপনারা জানেনই না — এই ক্রিয়াকর্মগুলিকেই এক কথায় সংস্কার বলে। এবং এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হল — সংস্কার কথাটির শব্দবোধ এবং তাৎপর্য। সাধারণত মন্দির-সংস্কার, পুষ্করিণী-সংস্কার, গঙ্গা-নদীর দূষণ-সংস্কার, এমনকী ভারতীয় সংবিধানের সংস্কারের কথাটাও আমরা আজকাল শুনে থাকি। তাতে সাধারণভাবে যা বুঝি, তা হল একটি বিষয় বা বস্তু দূষিত হলে বা সমাজ বা কালের সঙ্গে তা অসংলগ্ন হয়ে উঠলে আমরা তাকে দূষণমুক্ত করি বা তার পুনর্নবীকরণ ঘটাই। সাধারণ বুদ্ধিতে এটাই সংস্কার। লক্ষণীয়, সংস্কৃত, সংস্কৃতি এবং সংস্কার একই ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন। অবশ্য সম্‌পূর্বক কৃ-ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগে উপরিউক্ত শব্দগুলি

নিষ্পন্ন হলেও অর্থের দিক দিয়ে পূর্বস্থিত বস্তুর দূষণ মোচন করে নবীকরণের তাৎপর্যটা সবগুলি শব্দের মধ্যেই আছে।

'সংস্কার'-শব্দটার প্রথম তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাই ঋগ্‌বেদের মধ্যে। যদিও কথাটা সেখানে মোটেই 'সংস্কার' নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা 'সংস্কৃত'। বেদের মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে কখনো মন্ত্রপূত জলের ছিটে দিয়ে, কখনো বা কোনো বস্তুর ওপর হাত রেখে মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই বস্তুকে যখন বৃহত্তর বৈদিক কর্মের জন্য যোগ্য করে তোলা হত, তখনই ভাবা হত সেটি সংস্কৃত হয়েছে। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে — ন সংস্কৃতং প্র মিমীতো গমিষ্ঠান্তি নূনমশ্বিনোপস্তুতেহ — অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা এই সংস্কৃত যজ্ঞের হিংসা কোরো না। আসলে এখানে অশ্বিনীদ্বয়কে আহ্বান করার আগেই সোমরসে পরিপূর্ণ একটি পাত্র — বৈদিকরা যে পাত্রের নাম দিয়েছেন — 'ঘর্ম' — সেই ঘর্ম নামক পাত্রের মধ্যে সোমরসকে নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মন্ত্রপূত করা হয়েছে। সেই সংস্কৃত ঘর্মপাত্রটি যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্যই দেবতাকে বলা হচ্ছে — তুমি এই সংস্কৃত যজ্ঞের হিংসা করো না — অশ্বিনা ঘর্মমচ্ছ — এই যজ্ঞে তুমি এসো। ঋগ্‌বেদের অন্যত্র সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ইন্দ্র যখন যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয়েছেন তখন তাঁকে বলা হয়েছে 'রণায় সংস্কৃতঃ'। আবার যজ্ঞে বলি দেবার জন্য যেহেতু পশুর সংস্কার-সাধন করা হয়, তাই সে-কথা মাথায় রেখে এক জায়গায় বলা হচ্ছে গৃহস্থের অতি প্রয়োজনীয় গোরুটিকে যেন বলিদানের সংস্কারে সংস্কৃত না করা হয়। সংস্কার করলেই যেহেতু বলির প্রশ্ন ওঠে তাই প্রার্থনা করা হচ্ছে বেদের মধ্যে — ন সংস্কৃতত্রমুপ যন্তি তা অভি।

সত্যি কথা বলতে কী, বেদের মধ্যে যত মন্ত্র পেলাম, তাতে সংস্কার বা সংস্কৃত শব্দটির মূল অর্থ সম্বন্ধে এখনও আমাদের পরিষ্কার ধারণা হয়নি। এমনকী শতপথ ব্রাহ্মণে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেবার জন্য যখন হবি অর্থাৎ যজ্ঞে দেবার ঘি-টুকুকে সংস্কার করার কথা বলা হচ্ছে, তখনও বোধহয় সংস্কার শব্দটার অর্থ ভালো করে বুঝতে পারে না সাধারণ

মানুষ। কিন্তু এই শতপথ ব্রাহ্মণে যখন বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে — একটি রমণী সেই রকম পুরুষের কাছেই যাবে, যার একটি সাজানো-গোছানো বাড়ি আছে। এখানে 'সাজানো- গোছানো' বোঝাতে ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'সংস্কৃত' শব্দটি ব্যবহার করা আছে।

হায়! অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, হাজার হাজার বছর আগের সেই কোন্ বৈদিক কাল থেকে মেয়েরা একটা সজ্জিতগৃহ-সম্পত্তিওয়ালা পুরুষ পছন্দ করে! কথাটায় প্রমাণ হল যে, এটি একটি যেমন-তেমন বাড়ি নয়, শুধু একটি সুসজ্জিত গৃহকেই বলা যায়, 'সংস্কৃত গৃহ'। অন্য দিকে সংস্কৃত গৃহ বলতে এখানে মাজা-ধোয়া-মোছা একটি গৃহকেও বোঝাতে পারি। তাহলে সংস্কার মানে কী দাঁড়ায়? মাজা-ধোয়া-মোছা এমনটিই তো? সংস্কার শব্দের অর্থ আরও একটু সহজ করে পাওয়া যাবে পূর্বমীমাংসা দর্শনের অন্তর্গত একটি জৈমিনি-সূত্রের ব্যাখ্যায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে — যাজ্ঞিকরা সোমরস স্থাপন এবং অবসেচনের জন্য কতগুলি পাত্র ব্যবহার করেন যেগুলির নাম গ্রহ। প্রশ্ন উঠেছে — জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করার সময় বৈদিক বিধান হল — একটি বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ আমাদের ভাষায় ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে এই যজ্ঞের পাত্রটি ভালো করে মুছে নিতে হবে — দশাপবিত্রেণ গ্রহং সংমার্ষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসকরা প্রশ্ন তুললেন — এখানে 'গ্রহ' বলতে কি বিশেষ একটা যজ্ঞপাত্র বুঝব, না সবগুলোই মুছে নিতে হবে। একপক্ষ বললেন — না, ওই একটা মুছে নিলেই সবগুলোর কাজ হয়ে যাবে। অন্যেরা বললেন — তাই আবার হয় নাকি, একটা মুছতে বলেছে মানেই সবগুলো পাত্রই মুছে নিতে হবে। এবারে অন্যেরা বললেন — যদি তাই হয় তবে শুধু ওই 'গ্রহ' নামের পাত্রগুলি কেন, আরও যেসব যজ্ঞপাত্র আছে 'চমস' ইত্যাদি, সেগুলোও তো তা হলে ধুয়ে মুছে মেজে নিতে হবে?

ভাষ্যকার শবরস্বামী পূর্বপক্ষের এই প্রতিবাদের সমর্থনে একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন — যদি কেউ এমন বলে যে, — ওরে খাবার বেলা হল, বাসনগুলো মেজে নিয়ে আয় — তখন যেমন খাবার প্রয়োজন

অনুযায়ী থালা, বাটি, গেলাস সবই ধুয়ে নিয়ে আসতে হয়, তেমনই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে শুধু ওই 'গ্রহ' নামক যজ্ঞপাত্রটি মুছে নেবার কথা বলা হলেও যজ্ঞকার্যে যেগুলিই ব্যবহার্য পাত্র আছে, সবগুলিরই সংমার্জন-সংস্কার করতে হবে — যো যঃ সংমার্জন-সংস্কারার্হঃ স স সংমার্জিতব্যঃ।

দেখুন, একটা 'গ্রহ' মুছে নিতে হবে, নাকি দশটা, অথবা সঙ্গে 'চমস'-টাও, এ-সবের মীমাংসা করতে থাকুন মীমাংসাকেরা, এখানে যেটা বুঝতে হবে, সেটা হল — সংস্কার বলতে কখনো ধোয়া-মোছা-মেজে নেওয়াও যেমন বোঝানো হয়েছে, কখনো তেমনই যজ্ঞে ব্যবহার্য বস্তুর ওপর জলের ছিটে দিয়ে প্রোক্ষণ করাও বোঝানো হয়েছে। এ-ভাবে ভাবতে গেলে স্নান করাটাও একটা সংস্কার, চুল আঁচড়ানোটাও একটা সংস্কার। কেশ-সংস্কার বলতে চুল বাঁধার অর্থটা তো ধ্রুপদি সংস্কৃত সাহিত্যে শত শত বার পেয়েছি। যে মানুষ বা বস্তু এমনিতেই সুন্দর, তাকে আর মেজে-ঘষে সুন্দর করে তুলতে হয় না বলে তার কোনো সংস্কারেরও অপেক্ষা নেই — এমন অভিমত কালিদাসের — স্বভাবসুন্দরং বস্তু ন সংস্কারমপেক্ষতে। সংস্কার কথাটা যে খানিকটা পবিত্রীকরণ এবং খানিকটা অলংকরণ করার অর্থেই মূলত ব্যবহৃত হত, তার প্রমাণ দিয়েছেন কালিদাসই। হিমালয়ের ঘরে পার্বতী জন্মেছিলেন বলে সেই কন্যার মাধ্যমে হিমালয় যেমন পবিত্রীকৃত হয়েছিলেন, তেমনই তাঁর মর্যাদাও বেড়ে গিয়েছিল। এই কথাটা বোঝানোর জন্য কালিদাস উপমা দিয়েছেন — সংস্কারবত্যের গিরা মনীষী — অর্থাৎ পণ্ডিত-সজ্জনের বাক্য ব্যবহার যেমন পরিশীলিত এবং অলংকৃত হয়, সেই রকম সংস্কারবতী ভাষার মতো পার্বতীর দ্বারা হিমালয় পূত-পবিত্র হয়েছিলেন, বিভূষিতও হয়েছিলেন।

সংস্কার কথাটা আরও একভাবে ব্যবহৃত হয় জন্মান্তরের তত্ত্বে। আমরা কথায় বলি — পূর্বজন্মের সংস্কার। ভারতীয় দার্শনিকরা মানুষের শরীর কল্পনা করেছেন দু-ভাবে। এক তো এই সতত দৃশ্যমান স্থূল শরীর, কিন্তু এই শরীরের অন্তরে তাঁরা আরও একটি সূক্ষ্ম শরীর কল্পনা করেছেন

— যা তৈরি হয় মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারের একত্র সমাবেশে। এই সূক্ষ্ম শরীর নাকি মরণেও বিলীন হয় না। জন্মান্তরবাদী দার্শনিকদের মতে মানুষের পুনরায় জন্মগ্রহণের কাল পর্যন্ত এই মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকারের সূক্ষ্ম শরীর বর্তমান থাকে এবং পূর্বজন্মের সময় তা অনুস্যূত হয় মানবশরীরে। এক-একটি মানুষের স্বভাব এবং বুদ্ধির বিশেষত্ব দেখে আমরা যখন পূর্বজন্মের বিশেষ কোনো ভাব বা বৈশিষ্ট্যের কল্পনা করি, সেটা আসলে দার্শনিক মতে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকারের মিলনে জাত সূক্ষ্মদৈহিক সংস্কার। এই পূর্বজন্মের সংস্কার ভাবনা ভারতীয় পরম্পরায় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মহাকবিরাও এই ভাবনার প্রয়োগ করেছেন তাদের কাব্যে। কালিদাস রঘুবংশীয়দের সম্বন্ধে লিখেছেন — তাঁদের কাজকর্মের পরিণাম দেখেই বোঝা যেত কাজের আরম্ভটা ছিল কেমন, ঠিক যেমন মানুষের বিশেষত্ব দেখে বোঝা যায় যে মানুষের প্রাক্তন সংস্কারটুকু কী রকম — ফলানুমেয়াঃপ্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব। হয়তো এইসব তত্ত্বের একটা পরম্পরা থেকেই নৈয়ায়িকরা বলেছেন — সংস্কার থেকে যে জ্ঞান জন্মায় তাকে স্মৃতি বলে।

বস্তুত, পূর্বজন্মের সংস্কার, সংস্কারজন্য জ্ঞান এবং স্মৃতি — এগুলি সংস্কার শব্দের অন্যতম অর্থ হতে পারে বটে, এমনকী মানুষের মধ্যে নতুন কোনো ভাব অথবা বুদ্ধির প্রখরতা দেখে তবেই পূর্বজন্মের সংস্কারের কথা আমরা বলেও থাকি বটে, কিন্তু সংস্কার বলতে মূলত যা বোঝায় তা হল পূর্বতন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে নতুন কোনো গুণের সংযোজন। ভেবে দেখুন, এই স্নান করা বা চুল বাঁধার মধ্যে পূর্বতন বস্তুকে পুনঃসজ্জিত করার যে ব্যাপারটা আছে, যজ্ঞিবাড়ির পুজোর বাসন মেজে নেবার মধ্যেও কিন্তু সেই ব্যাপার আছে — পূর্বোক্ত 'গ্রহ' কিংবা 'চমসে'র ঝগড়াটা না হয় নিষ্পন্ন নাই হল।

আসলে সংস্কার বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন মীমাংসা-দর্শনের প্রবক্তারা এবং স্বয়ং শঙ্করাচার্য। শবরস্বামী জৈমিনি-সূত্রে উল্লিখিত সংস্কার শব্দের অর্থ বোঝানোর জন্য বলেছেন

সংস্কার হল সেইটা, যেটা করা হলে একটি পদার্থ একটি বিশেষ প্রয়োজনের বা একটি বিশেষ কাজের যোগ্য হয়ে ওঠে — সংস্কারো নাম স ভবতি, যস্মিন। জাতে পদার্থ ভবতি যোগ্যঃ কস্যচিদ্ অর্থস্য। সত্যি কথা বলতে কী, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি এই সংজ্ঞার মধ্যে দার্শনিকতা খুব নেই। যজ্ঞক্রিয়ায় ব্যবহার হবে, তেমন জিনিসের ঘষা-মাজার মধ্যেই যেন এই সংস্কারের তাৎপর্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শবরস্বামীর কথার মধ্যে যে গভীর বক্তব্য আছে, সেটা প্রকাশ করে দিয়েছেন তন্ত্রবার্তিকের লেখক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কুমারিল ভট্ট। তাঁর মতে সংস্কারের মাধ্যমে একটি পদার্থ বৃহত্তর প্রয়োজনের যোগ্য হয়ে ওঠে — এখানে শবরস্বামী কথিত ওই 'যোগ্য'তা ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় দুটি উপায়ে — করণীয় বিষয়ে দোষ নষ্ট করে দেয় সংস্কার, অথবা সংস্কার তাতে নতুন গুণের আমদানি করে — যোগ্যতা চ সর্বত্রৈব দ্বিপ্রকারা দোষাপনয়নেন গুণান্তরোপজননেন বা ভবতি।

কুমারিল ভট্টের এই ভাবনার সঙ্গে একেবারে মিলে যাবে বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ শংকরাচার্যের মত। তিনি তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে মোক্ষের স্বরূপ বোঝাবার সময় বললেন — মোক্ষ যেহেতু স্বয়ং পরব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম, অতএব মোক্ষের কোনো সংস্কার করা সম্ভব নয়। 'সংস্কার' সম্ভব নয় — এই প্রসঙ্গে সংস্কার শব্দটার তাৎপর্য নির্ধারণ করেছেন শংকর। বলেছেন — সংস্কার তাকেই বলে যা দিয়ে সংস্কার্য্য বস্তুর মধ্যে নতুন কোনো গুণের আধান করা যায় অথবা সংস্কার্য্য বস্তুর অন্তর্গত দোষ নষ্ট করে দেওয়া যায়। মোক্ষ ব্যাপারটা একেবারে ব্রহ্মের মতোই নির্বিকার-স্বরূপ বলে তার মধ্যে উৎকর্ষের যোজনা বা তার দোষহানির প্রশ্ন ওঠে না বলে তার কোনো সংস্কারেরও বালাই নেই। এবং একই সঙ্গে সবিনয়ে জানাই, ব্রহ্মতত্ত্ব বা মোক্ষতত্ত্ব নিয়ে আপাতত আমাদেরও কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শংকরের কাছ থেকে 'সংস্কার' শব্দের যে সংজ্ঞাটি পাওয়া গেল, সেটি আমাদের কাজে লাগবে আপ্রবন্ধ।

গুণাধান এবং দোষাপনয়ন — এই দুটি যদি সংস্কারের উদ্দেশ্য হয় তবে প্রথমটি বুঝতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় না। একজন মানুষ

চুল-দাড়ি কেটে স্নান করে নতুন একটা ধুতি পরার পর শরীরে এবং মনে যে সজীবতা অনুভব করে, সেটাকে দৃশ্যতই গুণাধান বলা যেতে পারে। একইভাবে যজ্ঞের ব্যবহার্য পাত্র ধুয়ে-মুছে নেওয়া বা চালের ওপর জলের ছিটে দিয়ে প্রোক্ষণ করার মধ্যেও যদি অত্যন্ত লৌকিকভাবে বা যৌক্তিক ভাবে ধুয়ে নেওয়ার প্রতীকী আচরণটাই বুঝি, তাহলেও বলব দৃশ্যতই যেখানে নতুন গুণের সংযোজন ঘটল, কিছু না হোক পরিষ্কার তো হল বটে। কিন্তু সংস্কার যখন দোষ অপনয়নের তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আদিম যুগের দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসের ছোঁয়া পাই। অশরীরী আত্মা, রাক্ষস, পূর্বজন্মের পাপ, সময়ে যে কাজ করা উচিত ছিল, তা না করার দোষ — সবই জুড়ে আছে এই দোষাপনয়নের পরিসরে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির মধ্যে সংস্কারের যে তাৎপর্য বৈদিক যুগ থেকে চালু হয়েছিল সেই তাৎপর্য আরেকভাবে ঢুকে পড়ল সম্পূর্ণ একটি মনুষ্য-জীবনের মধ্যে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তুকে সংস্কারের মাধ্যমে যজ্ঞের উপযুক্ত করে তোলাটা যেমন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমন করেই মানুষের জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাকে দেবভাবের উপযুক্ত করে তোলার জন্য তার জীবনে বিভিন্ন সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বৈদিকেরা।

আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণায় মনে হয় — সংস্কারগুলি সৃষ্টির পিছনে মনস্তত্ত্বের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। গভীর বিশ্বাস সেই মনস্তত্ত্বকে আরো পুষ্ট করেছে। চুল কাটা, নখ কাটা কী স্নান করার পর শারীরিক মানসিক স্ফূর্তি অবশ্যই আসে; সংস্কার পালনের মাধ্যমে সেই সাধারণ স্ফূর্তি আসে না বটে, তবে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে যে সামাজিক তুষ্টি বা আত্মসচেতনতা তৈরি হয়, হয়তো সেই তুষ্টি এবং সচেতনতা সেকালের মানুষকে এক ধরনের প্রত্যয় দিত। আরও দিত অন্যের তুলনায় বৃহত্তর এবং বিশিষ্ট হওয়ার এক পৃথক আস্বাদ। অবশ্য একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে — ভালো হোক অথবা এখনকার দৃষ্টিতে একেবারেই মন্দ, মনুষ্য জীবনের এই সংস্কারগুলি কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে সেই

সমাজের প্রয়োজন বুঝেই। সে প্রয়োজন এখনকার দিনের প্রয়োজনের সঙ্গে একরকম নয় বলেই আমাদের জানবার দায়িত্ব আসে — কোন প্রয়োজন, কোন ভাবনায় এবং কোন সামাজিক পরিবেশে আমাদের বহুল আচরিত সংস্কারগুলি জন্ম নিয়েছিল এবং কেনই বা সেগুলি সব টিকে থাকেনি এবং কেনই বা কিছু এখনও টিকে আছে।

ভারতবর্ষীয় সমাজে সংস্কারের সংখ্যা কয়টি, সে প্রশ্নে যাবার আগেই একটা কথা বিশেষভাবে জানানো দরকার। সেটা হল — সেকালের সামাজিক প্রয়োজন এবং বিশ্বাস — এদুটিরই ভিত্তি ছিল যজ্ঞ। এমনকি গর্ভধান থেকে উপনয়ন অথবা বিবাহ থেকে অন্ত্যেষ্টি — যেগুলিকে আমরা সাধারণত শরীর সংস্কার বলি — সেগুলিও তৈরি হয়েছিল যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই। মনু বলেছিলেন — বৈদিক মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে বামুন-ক্ষত্রিয়েরা যেন গর্ভাধান ইত্যাদি শরীর সংস্কার পালন করেন। তাতে পরকালেও পুণ্যফল লাভ করবে, ইহকালেও শুভ ফল — কার্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ। মনুর মতে, যে মানুষ সমস্ত সংস্কার পালন করেছে এবং সংস্কৃত দেহে যাগ যজ্ঞ করেছে, সে তার ফল পাবে পরকালে — পরলোকে সংস্কৃতস্য যাগাদিফল-সম্বন্ধাৎ — আর ইহকালের শুভফল তো একেবারেই স্পষ্ট, উপনয়নাদি সংস্কার হলে বেদপাঠে অধিকার মিলবে — ইহলোকে বেদাধ্যয়নয়াধিকারাৎ।

বেশ বোঝা যায় — বেদ এবং যজ্ঞকর্মকে আবর্তন করেই সংস্কারের জন্ম। শরীরের সংস্কারগুলি সম্বন্ধে প্রথম ভাবনাগুলি যে গ্রন্থের মধ্যে ভাবা হয়েছিল তার নাম গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে সমস্ত সংস্কারগুলির অনুষ্ঠান একাকার হয়ে রয়েছে গৃহস্থের করণীয় নানান যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে। পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ ইত্যাদি গার্হস্থ যজ্ঞের এক একটা অঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সংস্কারগুলির এক একটা গুচ্ছ। যেমন ধরুন, পাকযজ্ঞের একটি অংশের নাম 'হুত' — দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে আহুতি দেওয়া হচ্ছে — এমন হুত-কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিবাহ থেকে সীমন্তোন্নয়ন পর্যন্ত কতগুলি সংস্কার। এই রকমই পাকযজ্ঞের আরেকটা অংশের নাম

‘প্রহুত’ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতধর্ম থেকে মাথা ন্যাড়া করার চৌল সংস্কার। আবার উপনয়ন সমাবর্তনের মতো সংস্কারগুলি উল্লিখিত হচ্ছে ‘আহুত’ নামক পাকযজ্ঞের মধ্যে। গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে যজ্ঞ এবং সংস্কারগুলির এই পারস্পরিক মিত্রচারিতা থেকে এইটুকুই শুধু প্রমাণ হয় না যে, সংস্কারগুলি প্রথম অবস্থায় গার্হস্থ্য যজ্ঞগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মাত্র। গৃহ্যসূত্রগুলি ভালো করে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, সেখানে যজ্ঞগুলির প্রাধান্যই বেশি, সংস্কারগুলি সেখানে ব্যক্তি-গৃহস্থের ইতিকর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, দেবতাদের তুষ্ট করা বা তাঁদের অনুকূলে নিয়ে আসার মধ্যেই যজ্ঞের তাৎপর্য, আর সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য হল একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ভাবনার জন্য চিহ্নিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে — সে গৃহ্যসূত্রই হোক অথবা ধর্মসূত্রই হোক অথবা শতপথ-ঐতরেয় ইত্যাদি ব্রাহ্মণগ্রন্থ — এসব জায়গায় সংস্কারগুলিকে পৃথক একটি বর্গ হিসেবে কখনোই চেনা যায় না। গৌতমের ধর্মসূত্রে অন্তত চল্লিশটা সংস্কারের নাম আছে, কিন্তু সেই সংখ্যার মধ্যে গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, অন্নপ্রাশন বা উপনয়নের কথা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অগ্নিহোত্র-অগ্নিষ্টোমের কথা। স্নানও যেমন সেখানে একটা সংস্কার, আবার ব্রত-নিয়ম-চাতুর্মাস্যও এক-একটা সংস্কার; আশ্চর্যের বিষয় হল, অতিরাত্র বা সৌত্রামণি যাগ বাজপেয় অথবা সোমযাগের মতো বিশাল এবং বহুকীর্তিত যজ্ঞকাণ্ডের সঙ্গে যখন অন্নপ্রাশন, নামকরণের মতো গার্হস্থ্য কর্মগুলি একসঙ্গে স্থান পায়, তখন বোঝা যায় যে, অতি-প্রাচীন ভাবনায় অন্নপ্রাশন উপনয়নের মতো প্রক্রিয়াগুলি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যতটা অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম বা অতিরাত্র যজ্ঞ।

সময় অতীত হতে থাকলে আস্তে আস্তে কিন্তু এই বোধ তৈরি হতে থাকে যে, দেবতার তুষ্টিসাধক যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে একটি ব্যক্তির জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন বা নামকরণের মতো সংস্কারগুলির একত্র স্থান হওয়া উচিত

নয়। কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য দেবতাদের তুষ্টি এবং মনুষ্য জীবনে তাঁদের আনুকূল্য বিধান। অন্যদিকে সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য হল, মানুষের দেহ এবং মনকে উত্তরোত্তর সংস্কৃত করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করে তোলা। অনেক পরবর্তী কালে হলেও ধর্মশাস্ত্রকারেরা এই পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছিলেন। মনু-মহারাজ যখন লিখেছিলেন — গর্ভাধানাদি সংস্কার এবং বিবিধ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করার ফলে মানুষের শরীর এবং অন্তরাত্মা মোক্ষলাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে — মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ — ঠিক তখনও কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সংস্কারগুলির পার্থক্য তত স্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রকার হারীত অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ, এগুলি হল সব দৈব সংস্কার, আর জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, এগুলি হল ব্রাহ্ম সংস্কার। ব্রাহ্ম সংস্কারে সংস্কৃত মানুষ ঋষিদের সমানতা লাভ করে। আর দৈব সংস্কারগুলির মাধ্যমে মানুষ দেবতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে।

সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য মনুর মতে ব্রাহ্মীভবনই হোক, অথবা হারীতের মতে হোক তা ঋষিকল্পতার বাচক, আমাদের বিভিন্ন সংস্কারগুলির প্রক্রিয়া অনুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের বিশ্বাস অবিশ্বাস তথা সামাজিক প্রথা-সৃষ্টির কারণগুলিও বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়বে। দেখা যাবে, কতগুলি সংস্কার সৃষ্ট হয়েছিল একেবারে আদিম ভয়-ভীতি থেকে, কতগুলির পিছনে আছে বর্ণাশ্রমের প্রেক্ষাপটে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বলাভের অভিলাষ, আবার তার মধ্যেও কতগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধর্ম ও আত্মোন্নতির শ্রেয়োভাবনা। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে প্রাদেশিক ভিন্নতা আছে, ব্যক্তি, সমাজ, আচার-ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যেও যে স্বতো-ভিন্নতা আছে, সংস্কারগুলির সৃষ্টির পিছনেও সেই বিভিন্নতা আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশ এক একভাবে বৈদিক সংস্কার পালন করে। সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সংস্কার

পালনের রীতি-নীতিও এক রকম নয়।

আবার এক বিশাল বিস্তীর্ণ কাল-শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এককালে যে সব সংস্কারকে — যেমন ধরুন গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদিকে যেমন মূল্য দেওয়া হত, কালক্রমে সেগুলি উঠেই গেল। উঠে যেতেই হবে, কেননা সংস্কারের জন্ম সমাজ থেকে। সমাজে যেই জটিলতা এল, বেদ-বিহিত যাগ-যজ্ঞ যখন স্থান পরিবর্তন করে জ্ঞান আর মননকে আশ্রয় করল, ব্রাহ্মণ যখন যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ছাড়াও অন্য কর্মের দিকে নিজেদের দৃষ্টি প্রসারিত করল তখন সংস্কারগুলির মধ্যেও বেঁচে রইল শুধু তিনটি — অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহ। মরণোত্তর অন্ত্যেষ্টি এবং শ্রাদ্ধকে কেউ সংস্কার বলেন আবার কেউ বা নয়।

বৈদিক যুগের আরম্ভ সময়ে সংস্কারের সংখ্যা কত ছিল, সে বিষয়ে একটা কৌতূহল হতে পারে। অতি-প্রাচীন গৌতমের মতে সেই সংখ্যা চল্লিশটি — চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ অষ্টৌ চাত্মগুণাঃ। আগেই বলেছি, গৌতম নানাবিধ গার্হস্থ্য যজ্ঞক্রিয়ার অন্তরে সংস্কারগুলিকে নির্দেশ করেছেন, ফলত সংস্কারের সংখ্যাটা সেখানে চল্লিশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন সংস্কারগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা শুরু হয়েছে, তখনই কিন্তু সংস্কারের সংখ্যা কমে আসতে শুরু করেছে। যেমন মনুর মতে সংস্কারের সংখ্যা হল তেরোটি। যথাক্রমে — (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম (৫) নামধেয়, (৬) নিষ্ক্রমণ (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০) কেশান্ত, (১১) সমাবর্তন (১২) বিবাহ (১৩) শ্মশান। পরবর্তী কালের বিভিন্ন স্মৃতিতে এই সংখ্যা একটু কমে কখনো বারো বা দশটি হয়েছে। আবার কখনো বা বেড়ে ষোলোটাও হয়েছে। এই ষোলোর মধ্যে আবার একজন স্মার্ত যে সংস্কারটি উল্লেখ করেছেন, অন্যজন তা বদলে অন্য একটির উল্লেখ করেছেন, এমন ঘটনাও আছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা হল, মনুষ্য-জীবনের মরণ-শেষের শ্মশানক্রিয়া বা শ্রাদ্ধকে কেউ সংস্কারের মধ্যে ধরেছেন, আবার কেউ বা ধরেন নি।

মহর্ষি গৌতমের এই অত বড়ো লম্বা আটচল্লিশের লিস্টির মধ্যেও মানুষের অন্তিম সংস্কার শ্মশানক্রিয়া বা শ্রাদ্ধের কথা নেই, এমনকী গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং নামীদামি স্মৃতিগ্রন্থগুলির অনেকগুলিতেই আমাদের অতি প্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়ার কথা নেই। হয়তো এমন হতে পারে যে, অন্যান্য সংস্কারগুলি যেহেতু জীবন্ত মানুষের জীবনের সঙ্গেই জড়িত, সব সংস্কারগুলিই যেহেতু শুভসূচক, তাই অশুভ মরণের সংস্কার — অন্ত্যেষ্টি বা শ্রাদ্ধ — একত্রে স্থান পায়নি অন্নপ্রাশন অথবা উপনয়ন, বিবাহের মতো সংস্কারগুলির সঙ্গে । তবু কিছু কিছু গৃহ্যসূত্র এবং বিশেষত মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের মতো স্মার্তরা শ্মশান বা শ্রাদ্ধকে সংস্কারের মধ্যে ফেলেছেন বলে পরবর্তীকালে এটিও সংস্কার হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।

সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত নেমে আসা কতগুলি সংস্কার সম্বন্ধে এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং তা করব ইতিহাস এবং সমাজের অনুস্মৃতি মাথায় রেখে।

১। গর্ভাধান:

শব্দটা শুনলেই এর আভিধানিক অর্থটা যেন বোঝা যায়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় এক বিবাহিতা রমণীর গর্ভে পুরুষের সন্তানবীজ নিষিক্ত হয় তাকেই গর্ভাধান বলে। প্রশ্ন আসে, অবধারিত প্রশ্ন আসে — স্ত্রী-পুরুষের সাধারণ জীবনে সন্তান কামনা তো একসময় অতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তো এই স্বভাব-সন্নিকর্ষের মধ্যে আবার অনুষ্ঠান কিসের? আবার শুনি, এর মধ্যে মন্ত্র উচ্চারণেরও জায়গা আছে। কী আজগুবি কথা রে বাবা! এক সাহিত্যিক তো টিপ্পনি কেটে বলেছিলেন — পারেনও আপনারা! চরম এক রোমান্টিক অথবা বাস্তব মুহূর্তে দু-খানা মন্ত্র আউড়ে তবে কি না রতিলিপ্সু হতে হবে? এও কি একটা বিধান হল? ওই জন্যই এ সব উঠে গেছে।

আমি বলেছি — উঠে যাবার কারণ অন্য এবং এই সংস্কার-বিধানের কারণও অন্য। দুটোই বুঝতে হবে এবং ওই মন্ত্রটাও যদি বোঝেন তো আরো ভালো হয়। সত্যি কথা বলতে কী — প্রাক্‌বৈদিক যুগে সিন্ধুসভ্যতার সময় থেকে বৈদিক যুগে আমাদের সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারটা যখন সামাজিক প্রথা হিসাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে, গর্ভাধান অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই তার পরের যুগের ঘটনা। সমাজ যখন শিথিল ছিল, নারী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ যখন কোনো সামাজিক প্রথার আবর্তে বাঁধা পড়েনি, তখন তো সবটাই ছিল ইচ্ছে, ইচ্ছে এবং ইচ্ছে। কিন্তু গর্ভাধান অনুষ্ঠানের মধ্যে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের তাৎপর্য যতখানি, তার চেয়ে বেশি আছে সন্তানবাসনা এবং সন্তান ধারণের তাৎপর্য। শুধু সন্তান কথাটাও বলা ঠিক হবে না, বলা উচিত পুত্র-সন্তান।

আর্যরা এদেশে বহিরাগতই হোন অথবা এখানকার লোক, এরা বড়ো সমরপ্রিয় জাতি ছিলেন। মানুষের পূর্বাভ্যস্ত পুর-নগর বিদারণ করার সুবাদে পুরন্দর ইন্দ্র যাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা, সে জাতির রক্তে ছিল যুদ্ধ। আর যুদ্ধ করতে কী লাগে? পুরুষ লাগে, প্রচুর পুরুষ। যাযাবর আর্য জাতি যখন ভারতবর্ষে স্থায়ী হয়ে বসে গেছেন তখনও এই পুরুষের চাহিদা কমেনি। ফলে ঋগ্‌বেদের বহুতর মন্ত্রে মানুষের পুত্রকামনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। একটি সুমৃষ্ট গৃহে আবাস, খাদ্য, পুত্র আর বিনিময়ের জন্য পশু — এগুলি থাকলেই বৈদিক কালের মানুষ আত্মতৃপ্ত বোধ করত। নইলে বাড়ি হলে বেশ ভালো, পাল্য পশু পেলে বেশ ভালো, আর পুত্র লাভ হলে বেশ ভালো — গৃহা ভদ্রং, পশবো ভদ্রং প্রজা ভদ্রম্‌ — এমন কামনার কথা মন্ত্রবর্ণের মধ্যে প্রবেশ করত না।

বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে দার্শনিকতা অনেক আছে, কিন্তু এক সজীব সমাজের বাস্তবতাও এখানে কম নয়। ত্যাগ-বৈরাগ্য-ইন্দ্রিয় দমনের উচ্চ মানসিকতা বৈদিক যুগের পরিণতি হতে পারে, কিন্তু খোদ বেদের মন্ত্রে শতেক দেবতার কাছে আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রার্থনা বহুবার শোনা গেছে এবং সেই প্রার্থনার এক অঙ্গ যদি হয় ধন-সম্পত্তি-গৃহ তাহলে অন্য অঙ্গ

টি হল পুত্র সন্তান — প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্। শুধু পুত্র নয়, পুত্রধারা। এমন একটা বাড়ি বৈদিকদের পছন্দ যেখানে পুত্রেরাও পুনরায় পুত্রের পিতা হয় — পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি। এটা স্বচ্ছন্দে ভাবা যায় — বেদের মধ্যে পুত্রকামনার বৃত্তান্ত যতই থাক, আমরা যাকে গর্ভাধান বলছি, বৈদিক যুগে সেটা কোনো অনুষ্ঠানের রূপ পায়নি, সংস্কার হিসেবেও তা চিহ্নিত হয়নি। সংস্কার হিসেবে এটা এসেছে গৃহ্যসূত্রগুলির সময়ে যা অন্তত বৈদিক যুগের পাঁচশো বছর পর।

তবে হ্যাঁ, গৃহ্যসূত্রের মধ্যে এমন কিছুই বিধি-নিয়ম-সংস্কার আকারে আবদ্ধ হতে পারে না, বেদের মধ্যে যার ইঙ্গিত নেই। বিবাহ ব্যাপারটা যেহেতু বৈদিক যুগে একটি সুপরিকল্পিত রূপ ধারণ করেছিল, তাই বিবাহোত্তর জীবনে যৌন সুখ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর গর্ভে অনুরূপ পুত্র লাভ করার বাসনাও বেদে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। পুরুষের কথা তো ছেড়েই দিলাম, এমনকী মেয়েরাও যৌনসুখ লাভের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে, সে উদাহরণ ঋগ্বেদেই রয়েছে। কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন, দেববৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের কল্যাণে তাঁর রোগ সেরে যায় এবং তাঁর বিয়েও ঠিক হয়। দীর্ঘ রোগভোগের পর ঘোষার যে সম্ভোগ সামর্থ্য ফিরে এসেছে এবং সেই কারণেই তিনি যে এখন পুত্রের জন্ম দিতে পারেন সে বিষয়ে ঘোষা তাঁর সচেতনতা ঘোষণা করছেন — জনিষ্ট ঘোষা পতয়ৎকনীনকো ... অস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনম্। স্বামী হিসেবে একটি পুরুষ কেন এক যুবতীর কাম্য হয়ে ওঠে, তার কারণ দেখিয়ে ঘোষা বলেছেন — স্বামী তাঁর স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন করে, দীর্ঘকাল নিজের বাহু দিয়ে সে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে, স্ত্রীকে সে যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃলোকের যজ্ঞে তাদের নিযুক্ত করে। ঘোষার ধারণা — রমণীরা এইরকম পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।

তাহলে দেখুন বৈদিক সমাজের একটি নারীও জানে যে, তার স্বামী সার্থকতার প্রধানতম জৈবিক অঙ্গ হল সম্ভোগসুখ এবং সন্তান উৎপাদন।

পুরুষপ্রধান সমাজে এক রমণীর পক্ষে সম্ভোগ সুখের তাৎপর্য বিবাহ-পূর্ব জীবনে অনুধাবন করা কঠিন ছিল বলে ঘোষার মতো রমণী অশ্বিনীদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা করে বলেছে — পুরুষ-রমণীর সম্ভোগসুখ কেমন, তা আমি জানি না। তোমরা সেই সুখের বিষয় ভালো করে বর্ণনা করো — তস্য বিদ্ম তদু যু প্রবোচত। ঘোষা যতটুকুই জানেন, তাতে তাঁর এ ধারণাটা পরিষ্কার যে, সম্ভোগোত্তর কালে সন্তানধারণের জন্য একজন রেতঃসেক সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষ তাঁর প্রয়োজন। সেই রকম স্বামীর ঘরেই তিনি যেতে চান — প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি।

অন্যদিকে বৈদিক সমাজের পুরুষকে দেখুন। সম্ভোগসুখের কথা সে ভালোই জানে। কিন্তু পুরুষের শক্তি স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রবেশ করে কী অদ্ভুত উপায়ে একটি সন্তান সৃষ্টি করে — এ বিষয়ে তার বিস্ময় আছে। মাঝে মাঝে গর্ভ নষ্ট হওয়ার ফলে সন্তানের জন্ম নিরস্ত হয় বলে, তার বড়ো ভয়ও আছে, আশঙ্কাও আছে। ঠিক এই কারণেই সম্ভোগের পূর্বকালে সে বিভিন্ন দেবতার সাহায্য কামনা করে। তার স্বকীয় সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ সফলভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একবার সে বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে — বিষ্ণু এই নারীর স্ত্রী-অঙ্গকে গর্ভলাভের উপযুক্ত করে দিন। ত্বষ্টা এই গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির-নির্দিষ্ট করে দিন — বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু। প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন এবং ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন।

ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটিই ভবিষ্যতে আনুষ্ঠানিকভাবে গর্ভাধানের মন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ এই ঋক্‌টি যখন প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তখন কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টার হৃদয়ে ঠিক সেই সমস্যাগুলিই ক্রিয়া করেছে, যেগুলি একজন সন্তান-লিপ্সু শংকিত স্বামীর হৃদয় খণ্ডিত করত।

গর্ভধানের স্মার্ত ক্রিয়াকর্ম আরও কিছু আছে এবং তার সঙ্গেও আছে আরও অনেক মন্ত্র। মন্ত্রগুলির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় যেটা, সেটা হল প্রাগ্ আর্য সভ্যতার স্মৃতি হৃদয়ে রেখে ফলবতী বৃক্ষদেবতার কাছে নিজের পুত্রলাভের বাধাস্বরূপ সমস্ত পাপমুক্তির কামনা করা। সেকালে মানুষ

প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির রোষ, কোপ এবং অবদান — সব কিছুই মানুষ মনে রাখত বলে এই বৃক্ষলতার পরিবেশটিও তার কাছে আত্মীয়-পরিজনের মতো ছিল। প্রথম সন্তানের জনক এবং জননী হবার জন্য নবদম্পতি তাই প্রার্থনা করত — যে সব বৃক্ষের ফল নেই, এবং যারা ফলধারণের জন্য পুষ্পবতী হয়েছে, তারা সকলেই আমাদের সন্তানধারণের অন্তরায়ভূত পাপ থেকে মুক্ত করো — যা ফলিনী যা অফলা অপুষা যাশ্চ পুষ্পুণীঃ।

যেগুলি একটি সুস্থ সন্তান লাভের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের গর্ভলাভ সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যা এবং পুরুষের শারীরিক সমস্যা। গর্ভস্থ সন্তানের বিকলাঙ্গতার আশঙ্কা এবং দীর্ঘ দশ মাস সময়ের মধ্যে যাতে গর্ভপাত না ঘটে সেই ভাবনা। ঋগ্‌বেদের আরও যে দুটি মন্ত্র গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে পঠিত হয়, তার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল — দুটি স্ত্রীদেবতার উদ্দেশ্যে গর্ভরক্ষার প্রার্থনা এবং অশ্বিনীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে গর্ভরক্ষার প্রার্থনা। মনে রাখা দরকার, গর্ভধারণকালে অভিজ্ঞা স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধান এবং উপযুক্ত বৈদ্যের পরামর্শ দুইই দরকার হয়। সিনীবালী এবং সরস্বতী নামে দুই স্ত্রী দেবতা অভিজ্ঞা তত্ত্বাবধানকারিণী নারীর প্রতীক এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেববৈদ্য বলেই স্বীকৃত। পূর্বোক্তা ঘোষাও যেহেতু তিনি পূর্বে রোগিণী ছিলেন — তিনিও দাম্পত্যজীবনের সুখ এবং মঙ্গলের জন্য অশ্বিনীদ্বয়ের কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন।

কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল — ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রগুলির মধ্যে সন্তানলাভের ব্যাপারে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করে বৈদিক পুরুষ সন্তানের জন্ম বিষয়ে শুধুই নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছে এবং ওই মন্ত্রগুলির সামাজিক তাৎপর্যও এইখানেই। এইখানে অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না বলেই সন্তানলাভের মধ্যে যে আশঙ্কা, ভয় এবং পরিণামী বিস্ময় আছে, তা গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশেও দেবোচিত প্রার্থনায় সূচিত, নর-নারীর যৌন মিলনেও তাই এখানে দুটি যজ্ঞকাঠ (অরণি) ঘর্ষণের রূপকে আবৃত। দুটি অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ করে যজ্ঞাগ্নি উৎপাদন করতেন বৈদিকেরা। বৈদিক পুরুষ

তাঁর পত্নীর উদ্দেশে বলেছেন — হে পত্নী! অশ্বিনীদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করেছেন, দশম মাসে প্রসব হবার জন্য তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করছি — তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে।

গর্ভাধানের জন্য শারীরিক মিলনের যে প্রয়োজনটুকু আছে, হাজারো দৈবতত্ত্বে বিশ্বাসী বৈদিকেরা সেটা কখনোই বিস্মৃত হন নি বা সেটা দেবতার দয়ার ওপরেও ছেড়ে রাখেননি। ঋগ্‌বেদের সময় থেকে অথর্ববেদের কালে এসেই গর্ভাধানের ক্ষেত্রে শারীরিক মিলনের তাৎপর্য উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রূপকের মাধ্যমে অথর্ববেদ বলেছে — শমীলতার ওপরে আরূঢ় হয়েছে অশ্বত্থ বৃক্ষ। ওই স্থানেই পুত্রলাভের স্পষ্টতা আসে। স্ত্রীগর্ভে আমরা সেই পুত্র বহন করে আনি — তদ্ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীষু আভরামসি। অথর্ববেদে আরও কিছু মন্ত্র আছে এবং তা এখানে অনুচ্চারিত থাক — কিন্তু সেই মন্ত্র পরম্পরা বিচার করলে দেখা যাবে গর্ভাধানের আনুষ্ঠানিকতা এখান থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতা একেবারে পরিণত স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের আধার বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

এটা সত্যিই ভাবা যায় না। বৃহদারণ্যকের মতো গেরেমভারী উপনিষদ, যার এক-একটি বাক্য বেদান্তদর্শনের এক-একটি দিক খুলে দেয়, সেই উপনিষদের শেষে কিনা গর্ভাধানের আলোচনা? প্রাজ্ঞংমন্যরা বলে ফেলেন — প্রক্ষেপ। আমরা বলি — শেষেরও শেষ দেখুন। সদ্যোজাত শিশুটিকে জননীর কোলে বসিয়ে দিয়ে পিতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন তোমাকে স্তুতি করাই উচিত। তুমি সেই পুর্বকল্পের মৈত্রাবরুণী। তুমি এই বীর পুত্র প্রসব করে আমাদের বীরবান্ করেছ, তাই তুমিও বীরবতী হও — ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ, সা ত্বং বীরবতী ভব।

বীরবংশ এবং ঋষিবংশের পরম্পরা রক্ষা করার কথা মনে রেখেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলিকে আনুষ্ঠানিকতার আবর্তের

মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতাই পরবর্তী স্মৃতিগ্রন্থগুলির মধ্যে আচার এবং প্রথাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

পুত্রলাভের ইচ্ছায় গর্ভাধান যখন সংস্কারে পরিণত হয়েছে, তখন কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা প্রাচীন গ্রন্থমতে তার বিধান তৈরি হয়নি। তখন তার মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র এসেছে। অন্য জায়গায় অন্য প্রসঙ্গে বলা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান এসেছে, এমনকী দৈনন্দিন নিত্যপূজাপদ্ধতিও তার মধ্যে খানিকটা এসে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও আছে সেই বাস্তব দৃষ্টি, যার ওপরে ভিত্তি করে এত আচার, বিচার, সংস্কার। অর্থাৎ স্মার্তরা এটা ভোলেন নি যে, ঋতুকাল থেকে ষোলো দিনের মধ্যে গর্ভাধানের অনুষ্ঠানটি করতে হবে। সন্তানটি যাতে পুত্র হয় তার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা পুংনক্ষত্রের যোগ ঘটলে সাধারণ গণেশপুজো, মাতৃকাপূজা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ইত্যাদি সেরে মূল গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে বসতে হত। এখানে একটি চরুপাকের ব্যাপার আছে এবং তার মন্ত্রতন্ত্র নেওয়া হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে। চরু আহুতি দিয়ে অবশিষ্ট চরু নিজে খেয়ে স্ত্রীকে খাইয়ে হোমে বসতে হবে। ওই হোমের সময় বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে আহুতি পড়বে এবং তখনকার মন্ত্রগুলি কিন্তু সেই ঋগ্‌বেদের মন্ত্র, যা আমরা আগে বলেছি — বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু — থেকে সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে বলা মন্ত্র পর্যন্ত।

গর্ভাধানের মন্ত্রগুলির মধ্যে দেবতা হিসেবে কখনো বিষ্ণু, কখনো অশ্বিদ্বয়, কখনও অগ্নি কখনও বা সূর্যও আছেন। আরো আছেন অন্যান্য দেবতারাও। কিন্তু দিনের বেলায় ব্রত-পূজা-হোমের শেষ পর্বে সূর্যকে অর্ঘ্য দেবার সময় সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডটাকে 'নবপুষ্পোৎসব' বলে বর্ণনা করার মধ্যে বিশ্ব-পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা যেমন আছে, তেমনই আছে এক জাগ্রত বিশ্বাস, যাতে বোঝা যায় ফলবান বৃক্ষ দেবতার মতো পুষ্পবতী রমণীও সন্তানরূপ ফলের সঙ্গে যুক্ত হবে — বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্তা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ। নবপুষ্পোৎসবে হ্যেতৎ গৃহানার্ঘ্যং দিবাকরঃ। হোমের শেষে সূর্যপ্রণাম শেষ হবার পর যজ্ঞের

অবশেষ হিসেবে পত্নী যা পাবেন, তা হল একটি ফল। পত্নী হস্তপ্রসারণ করে সেটি গ্রহণ করেন সন্তানলাভের পূর্বপ্রতীক হিসেবে।

আমাকে এই রকম একটি যজ্ঞে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। আগে কিছুই বুঝিনি, কিছু জানতামও না। আমারই এক ভাইয়ের পুত্র-কন্যা হয় না, মনে তার বড়ো দুঃখ। ওষুধ-বিষুধ-ডাক্তারি শেষ হল। শল্যচিকিৎসায় ভ্রাতৃবধূর সন্তান হতে গিয়েও কিছু অঙ্গহানিও ঘটল। শেষে পুরোহিত ডেকে হোম-যজ্ঞ করানো হল — দেখলাম পুরোহিত যা করে গেলেন, তার সবটাই গর্ভাধানের সংস্কার এবং পরিশেষে একটি ফলও ধরিয়ে দিলেন ভ্রাতৃবধূর হাতে। সে ফল খেয়ে বা হস্তে ধারণ করে ভ্রাতৃবধূর এখনও কোনো পুত্র হয়নি। কিন্তু সে অন্য কথা। স্মার্তদের এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা যা বলেন, তা অবশ্য ডাক্তারদের কথার সঙ্গেও মিলে যায়। অধিক বয়সে বিবাহ স্মার্তদেরও পছন্দ নয়, ডাক্তারদেরও পছন্দ নয়। স্মার্তরা যেটাকে নৈতিক অন্যায় বলে মনে করেন, ডাক্তাররা সেটাকে শারীরিক সমস্যা-সৃষ্টির কারণ বলে মনে করেন। একথা অনস্বীকার্য, যে বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মহাভারত-রামায়ণের যুগ পর্যন্তও আমাদের দেশে অতি অল্পবয়সে বিবাহ হত না। আবার অতি অধিক বয়সেও হত না। কাজেই পূর্ণযৌবনা রমণীর সন্তান ধারণের সুস্থতা অনেক বেশি থাকত বলেই সকাল গড়িয়ে দুপুর পর্যন্ত গর্ভাধানের ব্রত-নিয়ম পালন করেই রাত্রিকালে সহবাসের মন্ত্র পড়তেন স্বামীরা।

শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র গর্ভাধান-সংস্কারের অন্তরে চতুর্থী কর্ম বলে একটি স্মার্তক্রিয়ার উল্লেখ করেছে। সেটা আসলে বিবাহের তিন দিন পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত কর্ম। গর্ভাধানের হোম-যজ্ঞের পর চতুর্থী কর্ম অন্য কোনো স্মার্ত কর্ম সূচিত করে না। বরং বলা উচিত, দিবসের স্মার্তক্রিয়ার পর এ হল নিশীথরাতের শারীরিক অবসর। রজোদর্শনের ঘটনাটা এখানে স্বতঃসিদ্ধ। পরবর্তী সময়ে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স কম হয়ে যাওয়ায় চতুর্থী কর্মের আচারও উঠে যায়। থেকে যায় শুধুই গর্ভাধান। অন্যেরা চতুর্থী কর্ম শব্দটা বাদ দিয়ে বলেছেন নিষেক কর্ম। এতে যে-সব

মন্ত্র উচ্চারণ করে রমণীর যেসব অঙ্গ স্পর্শ করার বিধি আছে, তাতে উচ্চতর গভীর ভাবনা তো কিছু নেইই, বরঞ্চ মন্ত্রবর্ণের শব্দ যে-সব অর্থ প্রকাশ করে, তাতে স্ত্রী-পুরুষের মিলন আরও গাঢ়তর হয়। কিন্তু এর মধ্যেও যেটা খুব লক্ষ্য করার মতো, তা হল মন্ত্রোচ্চারণ বা যৌনমিলনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৈদ্যশাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপও আছে। দূর্বা বা অশ্বগন্ধার পিষ্টরস স্ত্রীর নাকে নস্যি দেবার মতো করে দিয়ে নিয়ে তার পর মন্ত্র-তন্ত্র এবং সহবাস বিধি।

গর্ভাধানের শেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটি হল — যেমন এই পৃথিবীর গর্ভে অগ্নি আছে, যেমন আকাশের গর্ভে আছেন ইন্দ্র, দিক্‌সমূহের গর্ভে যেমন আছে বায়ু সেই রকম আমি তোমার গর্ভাধান করলাম। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের কেউ কেউ বলেন প্রথম সন্তানলাভের আগে একবারই মাত্র এই গর্ভাধানের ক্রিয়াকাণ্ড আচরণীয়। অন্যেরা বলেছেন — না, প্রত্যেক সন্তানলাভের পূর্বেই গর্ভাধানের স্মার্ত ক্রিয়া বিধেয়। বলিহারি এই স্মার্তদের। এরা বুঝলেন না — নারী-পুরুষের সহবাসের অভিসন্ধিই যেখানে প্রধান, সেখানে এত ক্রিয়াকাণ্ড, হোমযজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণের জটিলতা থাকলে সে সংস্কার বেশিদিন টিকে থাকে না। টিকে থাকেওনি। অবশ্য এই সংস্কার উঠে যাবার পিছনে স্মার্তক্রিয়ার জটিলতার চাইতে সামাজিক কারণই বেশি। পঞ্চনদীর জলধোয়া অঞ্চল পিছনে রেখে যে জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, সে জাতির প্রত্যেকটি পুরুষ নিজেদের বহুলভাবে প্রসারিত করার জন্যই এক এক জনে দেবতার কাছে দশটি করে পুত্র চেয়েছে। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এই প্রসারণ কর্ম অনেকটাই পূর্ণ হয়ে ওঠে, সরস্বতী-দৃষদ্বতীর অন্তর দেশ ছাড়িয়ে উত্তরে, দক্ষিণের এবং পূর্বেও যখন আর্যদের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আর দশ-দশটা পুত্র সন্তানের জন্য আর্য পিতাকে কেঁদে মরতে হয়নি। গর্ভধান-কর্মের স্মার্ত সংস্কারও তাই সমাজ থেকে লুপ্ত হল। যা পড়ে রইল, তা একেবারেই আদিম সংস্কার, অনাদি অনন্ত সহবাসবিধি।

২। পুংসবন:

সবন মানে প্রসব; জন্ম। পুংসবন মানে পুত্র-সন্তান প্রসবের জন্য পালনীয় নিয়ম-বিধি, সংস্কার। সংস্কারগুলির অনুক্রমে এটি দ্বিতীয় সংস্কার। পুংসবনের সংজ্ঞা দেবার সময় স্মার্তরা একেবারে পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই সংস্কার পালনের ফলে পুত্র-সন্তানই জন্মায় — যেন কর্মণা নিমিত্তেন গর্ভিণী পুমাংসমেব সূতে তৎপুংসবনম্। আমরা আগেই বলেছি। বেদের যুগে কোনো সংস্কারেরই সুপরিকল্পিত রূপ ছিল না। কিন্তু গৃহ্যসূত্রগুলিতে বা স্মৃতিগুলির মধ্যে এগুলি যখন পালনীয় সংস্কারের রূপ ধারণ করেছে, তার সূত্রটা বেদের মধ্যেই অবশ্য আছে এবং সেই সেই বেদমন্ত্রই সংস্কারের পদ্ধতির মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে। একটি পুরুষ অথবা একটি বীর পুত্রলাভের মূল প্রার্থনাটা আছে অথর্ববেদে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে — বাণ যেমন তূণের মধ্যে অবস্থান করে তেমনই তোমারও গর্ভে একটি পুরুষ আসুক — আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্। দশ মাসের পর একটি বীর পুত্র জন্মলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

মনে রাখা দরকার, অথর্ববেদ মানেই ঋগ্‌বেদের সময়ের অনেক পরে। একটা সময় ছিল যখন অথর্ববেদকে বেদের মধ্যেই গণ্য করা হত না। বেদের সংখ্যা তখন ছিল তিন, যাকে একত্রে বলা হত ত্রয়ী। অথর্ব বেদের মধ্যে পরবর্তী তান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিরও সূত্রপাত ঘটে। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি মন্ত্রের সঙ্গে কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক এবং কিছু কিছু বৈদ্যশাস্ত্রীয় লতা, পাতা, ওষধির প্রথম প্রয়োগ আমরা অথর্ববেদেই দেখতে পাই। একটি পুত্রসন্তান লাভের জন্য অথর্ববেদে যে মন্ত্ররাশি উচ্চারিত হয়েছে, তাকে বৈদিকরা বেদের মধ্যেই বলেছেন 'প্রাজাপত্য' অর্থাৎ পুত্রলাভের অনুষ্ঠান। অথর্ববেদের ওই একই সূক্তের একটি মন্ত্রে স্বামী একটি বিশেষ লতাগাছির নির্যাস স্ত্রীর ওপর প্রয়োগ করে যে মন্ত্র বলেছেন তাতে মনে হয়,তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পুত্র-সন্তান লাভের ক্ষেত্রে যদি

কোনো বাধা থাকে, সেই বাধা দূর করবে ওই ওষধি। মন্ত্রটি অবশ্য ভারি সুন্দর — যে লতার পিতা হলেন অন্তরীক্ষ, মাতা হলেন পৃথিবী এবং যার মূল প্রোথিত আছে সমুদ্রে, সেই দৈবী লতা তোমার পুত্রলাভের সহায় হোক।

লক্ষণীয়, এখানেও সমুদ্রের রূপকে সেই গর্ভ-কল্পনা বিধৃত, ঠিক যেমন মাতা হিসেবে ভূমি বা ক্ষেত্র এবং পিতা হিসেবে অন্তরীক্ষ। পরবর্তী কালে অনুষ্ঠানটির নাম যে 'পুংসবন'ই রয়ে গেল, সেই নামটা কিন্তু অথর্ববেদ থেকেই নেওয়া। সেই যে মন্ত্রটি, যেখানে শমীলতার ওপরে আরূঢ় হয় অশ্বত্থ বৃক্ষ — শমীম্ অশ্বত্থ আরূঢ় — নর-নারীর এই প্রতীকী মিলনের ফল হিসাবেই এখানে পুরুষ-সন্তান লাভের বাচক 'পুংসবন' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে।

পুংসবনের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম — যেগুলি গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে বিস্তারিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে — গর্ভলাভ করার পর তৃতীয় মাস থেকে আরম্ভ করে অষ্টম মাস পর্যন্ত যে-কোনো একটি সময়ে এই অনুষ্ঠান বিধেয়। পুংসবনের ক্ষেত্রে চন্দ্রের সঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগটিকে খুব মঙ্গলজনক মনে করা হলেও মাসের ব্যাপারেও যেমন গৃহ্যসূত্রগুলির বিভিন্নতা আছে তেমনই নক্ষত্রযোগের ব্যাপারেও তাই। হস্তা, মূলা, শ্রবণা, অনুরাধা, উত্তরা ইত্যাদি নক্ষত্রযোগও পুংসবনের ক্ষেত্রে সমান মঙ্গলজনক বলে অনেকেই মনে করেন। কোন্ মাসে পুংসবন করতে হবে — এ ব্যাপারে জাতুকর্ণ্য, বৈজবাপ, গোভিল, খদির প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যেমন গর্ভলাভের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাসকেই প্রশস্ত বলে মনে করেছেন, তেমনই মানব গৃহ্যসূত্র, অথবা দেবপাল, ব্রহ্মবলের মতো টীকাকারেরা সপ্তম বা অষ্টম মাসকেই প্রশস্ত বলে মনে করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে সযৌক্তিক মতটি বোধহয় দিয়েছেন, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতির মতো বিদগ্ধ ধর্মশাস্ত্রকারেরা। শিশু যখন গর্ভিণীর গর্ভের মধ্যে নড়াচড়া করতে থাকে, তাঁর আগেই পুংসবন অনুষ্ঠান করে ফেলতে হবে বলে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন — সবনং স্পন্দনাৎ পুরা। ওদিকে বৃহস্পতি বলেছেন যে, ওই

অনুষ্ঠান করতে হবে গর্ভস্থ শিশুর সঞ্চরণ অনুভব করার পরে — সবনং স্পন্দতে শিশৌ।

সত্যি কথা বলতে কী — প্রাচীনেরা এটা বুঝতেন না, যেমন আধুনিকেরা অনেক সময় বুঝেও বুঝতে চান না যে — গর্ভাধানের মুহূর্তেই পুত্র অথবা কন্যার জন্ম নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত হয়ে যায়। গর্ভ আহিত হবার পরও যেমন গর্ভিণীর ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে কোনো এক সময় যে-রকম সাধভক্ষণের রীতি এখনও প্রচলিত আছে, পুংসবনের রীতিও অনেকটা ওই রকমই। গর্ভলাভের অতদিন পরেও একটি পুরুষ শিশুকে দিয়ে গর্ভিণীর মুখে পরমান্ন তুলে দিয়ে এখনও যেমন গর্ভস্থ শিশুটিকে কোনো অলৌকিক নিয়মে পুরুষ সন্তানে পরিণত করার দুরাশা পোষণ করা হয়, পুংসবনের অনুষ্ঠানেও তাই হত।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে পুংসবনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আগের দিনে গর্ভিনীকে হবিষ্য খেয়ে থাকতে হয়। পরের দিন স্ত্রী নতুন কাপড় পরে স্বামীর বাঁ পাশে এসে বসতেন। অনুষ্ঠানের দিনে সাধারণ সন্ধ্যা-আহ্নিক, মাতৃকাপূজা বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ তো করতেই হয়, কিন্তু সে তুলনায় পুংসবনের অনুষ্ঠান খুব বড়ো নয়। শুভ দিনে শুভ লগ্ন উপস্থিত হলে স্বামী, স্ত্রীর ডান হাতের ওপর দই-মাখানো দুটি মাষকলাইয়ের দানা এবং একটি যব রেখে তিনবার প্রশ্ন করবেন — তুমি কী পান করছ — কিং পিবসি? স্ত্রীও তিনবার বললেন — 'পুংসবন' পান করছি।

এখনকার মানুষের এ সব দেখলে অবাক হবেন। মাষকলাইয়ের দানা, যব — এসব এখন হাসির খোরাকও বটে। আসলে প্রাচীনেরা এই সব প্রকৃতিজাত খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়ে কতগুলি প্রতীকী আচরণ করতেন সেটা খুব ভালো বোঝা যায়, আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে বিহিত পুংসবনের প্রক্রিয়া দেখলে। মাষকলাইয়ের দুটি দানা এবং যবের বদলে তিনি বলেছেন — বটগাছের দুটি ফল সহ একটি ছোট্ট শাখা যা পূর্ব অথবা উত্তর দিকে মুখ করে রয়েছে, সেইটে ছিঁড়ে এনে সেটিকে ছেঁচে তার রস গর্ভিণীর নাকে দিতে হবে স্বামীকে। মন্ত্রটা ওই একই। বস্তুত দুই মাষকলাইয়ের সঙ্গে

একটি যবের দানা অথবা দুটি ফল সহ বটের শাখা — এই দুটিই পুরুষের নিম্নাঙ্গের প্রতীক। যা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে ন্যগ্রোধফলকে 'বৃষণ' বলে আপস্তম্বে উল্লিখিত হওয়ায় — ন্যগ্রোধস্য বা প্রাচ্যুদীচী বা শাখা ততঃ সবৃষণাং শুঙ্গামস্বহাজ্য্য। পূর্বোক্ত বটফল এবং তার শাখা আহরণ করাটা অসুবিধেজনক বলেই পরবর্তী কালে এর বিকল্প হিসেবে গর্ভিণীর নাকে দূর্বার রস দেবার রীতি তৈরি হয়েছিল। তবে একই সঙ্গে খেয়াল করতে হবে যে শিশিরের জলে এই দূর্বা পেষণ করার নিয়ম এবং তা পেষণ করে দেবেন এমন এক দম্পতি যার ছেলে বেঁচে আছে।

তবে ন্যগ্রোধ ফলের রসেই হোক আর দূর্বার হোক, সর্বত্রই ওই রস দেবার মন্ত্রটা সেই পূর্বোক্ত অথর্ববেদের মন্ত্র — তোমার গর্ভে ছেলে আসুক — আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্। একই সঙ্গে যে দ্বিতীয় মন্ত্রটি পড়া হয়, তার সারার্থ করলে দাঁড়ায় — দেবতাদের মধ্যে প্রথম হলেন অগ্নি। তিনি মৃত্যুর পাশ থেকে মুক্ত করুন এই পুত্রকে। বরুণ দেবতা সেইভাবে সহায় হোন যাতে এই স্ত্রীর পুত্রটিরও কোনো পাপ না লাগে — যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ।

স্মার্ত প্রক্রিয়ায় পুংসবনের আরও যে সব মন্ত্র আছে, সেগুলি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় — পুংসবনের মাধ্যমে পুত্রসন্তানের জন্ম নিশ্চিত করা ছাড়াও আরও যে ভাবনাটা থাকত, তা হল — কোনোভাবেই যেন গর্ভ নষ্ট না হয়ে যায়, গর্ভপাত বা 'অ্যাবরশন' যেন না ঘটে। পুংসবনের পর একটি চরুহোম করে যে সব মন্ত্র পড়তে হয়, তার মধ্যে আসল উদ্দেশ্যটাই হল — এই গর্ভের ওপর যার হিংসা আছে, আমি মন্ত্র পড়ে তাকে নাশ করছি — তমিতো নাশয়ামি। এই গর্ভহিংসক প্রাণীদের মধ্যে সরীসৃপ থেকে আরম্ভ করে মানুষ সকলেই আছে, যারা গর্ভের ভেতরে প্রবেশ করে গর্ভ লেহন করে গর্ভনাশ ঘটাতে পারে অথবা বাইরে থেকে গর্ভজাত পুত্রকে আক্রমণ করতে পারে।

প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাচীনেরা যে মন্ত্রই পড়ে থাকুন, পুংসবন সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য পুত্র জন্ম এবং সেই জন্মের দোষ যাতে কিছু না

ঘটে তার ব্যবস্থা করা। এটা আরও ভালো বোঝা যায়, যখন দেখি পুংসবন সংস্কারের অংশ হিসেবেই যখন আরও একটি সংস্কার পালন করা হত, যার নাম 'অনবলোভন'। ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় শব্দটা হওয়া উচিত 'অনবলোপন' অর্থাৎ গর্ভ যাতে অবলুপ্ত না হয়, সেই চেষ্টা। সেকালের মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনা অত ছিল না। গর্ভপাত এবং রোগ-ভোগে গর্ভ নষ্ট হওয়ার ঘটনা ছিল অসংখ্য। অতএব তাঁদের ভাবনা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতার কাছে প্রার্থনা করে এবং যথাবুদ্ধি দূর্বারস ইত্যাদি বৈদ্যশাস্ত্রীয় ঔষধ প্রয়োগ করে তাঁরা গর্ভপাত রোধ করতে চাইতেন। সংস্কারের পর্যায়ে সেটাই কিন্তু অনবলোভন — ন ক্ষুভ্যেন্ ন স্রবেদ্ যেন তৎকর্ম অনবলোভনম্। তবে ভারী আশ্চর্য হল — 'অনবলোভন' সংস্কারে যে সব মন্ত্র পড়া হত, তা হল ঋগ্‌বেদের হিরণ্যগর্ভ সূক্ত, যার মধ্যে অণ্ডাকারে স্থিত এই পৃথিবীর আদিম রহস্য বর্ণিত। এবং অন্যটি পুরুষসূক্ত যার মন্ত্রে আদি পুরুষ নারায়ণের পূজা হয় এখনও। মন্ত্রগুলি থেকে বেশ বোঝা যায়, গর্ভপাত বা এই জাতীয় দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সাধারণ দোষহানিকর মন্ত্রেই এই সংস্কার পালিত হত।

শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে এই গালভরা নামটিও আর নেই। 'অনবলোভন' এখানে সোজাসুজি 'গর্ভরক্ষণ' সংস্কারে পরিণত। এখানে যা মন্ত্র আছে তাতে স্ত্রীর মাথার চুল থেকে পা, এমনকী গায়ের লোম পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্গে ঘি মাখিয়ে সামগ্রিকভাবে গর্ভরক্ষণের মন্ত্র পড়া হয়েছে। গর্ভরক্ষণের আশয়টি গৃহ্যসূত্রগুলির পরম্পরাতেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় আমাদের লৌকিক যুক্তিগুলিও আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রথম কথাটা দেখুন, পুংসবন কর্মের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে গর্ভলাভের দ্বিতীয় থেকে অষ্টম মাস পর্যন্ত। এর কারণ একটাই — সন্তানজন্মের ক্ষেত্রে গর্ভিণীর কষ্ট, অস্বস্তি এবং শারীরিক বিকার একেক জনের একেক রকম সময়ে প্রকট হয়। অতএব ওই সব সময় বুঝেই পুংসবনের ব্যবস্থা করতেন প্রাচীনেরা। আবার দেখুন, বৃহস্পতি লিখেছেন — প্রথম গর্ভলাভের সময় তৃতীয় মাসে পুংসবন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু পরবর্তী গর্ভলাভের ক্ষেত্রে চতুর্থ, ষষ্ঠ অথবা

অষ্টমমাসেও পুংসবন চলবে। তার মানে কী? প্রথম গর্ভলাভের ক্ষেত্রে শারীরিক অস্বস্তি এবং কষ্টের যে সব অভিজ্ঞতা থাকে, পরবর্তী গর্ভলাভের সময় সেটা বুঝে নিয়েই পুংসবনের ব্যবস্থা হয়েছে।

আরো একটা ব্যাপার গর্ভলাভের ক্ষেত্রে দোষ নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে বটফলের নির্যাস বা দুর্বারসের ফোঁটা গর্ভিণীর ডান নাকে দেবারও একটা বৈদ্যশাস্ত্রীয় যুক্তি আছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এটা গুণাধান বটে, তবে বৈদ্যক যুক্তিতে সুশ্রুত যা বলেছেন, তাই ঢুকে পড়েছে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে। সুশ্রুত লিখেছেন — গর্ভলাভের সময় বটের শুঠির নির্যাস গর্ভিণীর অনেক কষ্ট কমিয়ে দেয়। বিশেষ ভাবে পিত্তাধিক্য এবং গায়ের জ্বালা কমানোর জন্য বটের শুঠি, সুলক্ষণা, সহদেবী বা বিশ্বদেব গাছের ছাল ছেঁচে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সেই রস তিন-চার ফোঁটা গর্ভিণীর নাকে দিতে হবে এবং সেই রস সে যাতে থু-থু করে না ফেলে দেয়, তাও দেখতে হবে। গর্ভিণীর শারীরিক কষ্ট কমে যাবে এতেই। তা হলে দেখুন, বৈদ্যের ব্যবস্থাপত্র কীভাবে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে স্থান করে বেশি যুক্তিসহ হয়ে উঠেছে।

৩। সীমন্তোন্নয়ন:

সীমন্ত, সীমা — এই শব্দগুলির অর্থ সিঁথি। সিঁথি কেটে চুল ভাগ করে দেওয়ার নাম সীমন্তোন্নয়ন — সীমন্ত উন্নীয়তে যস্মিন্ কর্মণি। গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে এই সংস্কারের একটি পরিণত রূপ উপলব্ধ হবার আগে শুধুমাত্র মন্ত্রব্রাহ্মণ নামে একটি প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে আমরা সীমন্তোন্নয়নের কথা পাই। সেখানে যে মন্ত্র আছে তাতে, আদি পিতা কশ্যপ প্রজাপতি দেবমাতা অদিতির সীমন্তোন্নয়ন করে তাঁর গর্ভজাত সন্তানের ঋদ্ধি এবং সৌভাগ্য সূচনা করেছিলেন। তারই অনুকরণ গর্ভজাত পুত্রের আয়ু ও সৌভাগ্য কামনা করে মানুষও আপন গর্ভিণী স্ত্রীর সীমন্ত বিভাগ করেছে — তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদৃষ্টি কৃণোমি।

পুত্রের সৌভাগ্য এবং ঋষি কামনায় এই উৎসটুকুই পরবর্তীকালের মানুষের মধ্যে সংস্কারের রূপ ধারণ করেছে।

সংস্কারের যে সাধারণ লক্ষণ — দোষাপনয়ন বা গুণাধান — তার মধ্যে প্রথমটাই এখানে খাটে। কারণ হারীত লিখেছেন — গর্ভাধানের ব্যাপারে মাতা-পিতার যে সব দোষ থাকে সীমন্তোন্নয়ন সেই দোষ নষ্ট করে — উন্নয়নান্ মাতাপিতৃজং পানম্ অপোহতি। এই বিশ্বাসের কথাটুকু বাদ দিলে সীমন্তকর্মের জন্য কতগুলি তাৎপর্য আছে। প্রথম তাৎপর্য অবশ্যই সেই গর্ভের সুরক্ষা। তবে গর্ভস্থ সন্তানের সুরক্ষার চিন্তা করতে গিয়ে এমন কিছু বিধান এখানে প্রাচীনেরা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে গর্ভিণীর মানসিক এবং শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভাবনাটাও এই সংস্কারের আন্তর তাৎপর্য হয়ে ওঠে।

সীমন্ত-কর্মের সময় বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে এবং স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে এক রকম নয়। গর্ভলাভের তৃতীয় মাস থেকে অষ্টম মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই কর্ম অনুষ্ঠান করার রীতিভেদ থাকার ফলে এর সাংস্কারিক তাৎপর্য অনেকটাই লঘু হয়ে গেছে। এমনকী এই অনুষ্ঠান কখনো বিবাহকর্মের অন্যতম অঙ্গ হিসাবেও চিহ্নিত হয়ে গেছে, কখনো বা পুত্রজন্মের পরেও এই সীমন্তোন্নয়নের বিধান রয়ে গেছে। সীমন্তোন্নয়নের প্রশস্ত দিন হিসেবে চন্দ্রের সঙ্গে সেই পুংনক্ষত্রের যোগের বিধান অবশ্যই পুত্রজন্মের ইঙ্গিতবহ। স্ত্রী এই দিন উপবাসী থাকবেন এবং স্বামী যথারীতি সন্ধ্যাহ্নিক, মাতৃকাপূজা এবং নান্দীশ্রাদ্ধ সেরে হোমাগ্নির পশ্চিম দিকে একটি কোমল পুরু উচ্চাসনের ওপর স্ত্রীকে বসতে বলবেন। এমন একটা আসনের ব্যবস্থা দেখেই অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন যে, গর্ভিণী শারীরিক অবস্থা মাথায় রেখেই শাস্ত্রকারেরা এমন বিধান দিয়েছেন।

সীমন্ত-কর্মের অনুষ্ঠান খুব ছোটো। স্বামী একটি উদুম্বর গাছের (ডুমুর গাছ) দুই স্তবক যুগ্মসংখ্যক পক্ব ফল নিয়ে স্ত্রীর চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি কেটে দেবেন — কপাল থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত। আমরা জানি ডুমুরের ফল দিয়ে সিঁথি কাটা যায় না, তাই এর সঙ্গে কুশ

এবং তিনটি শ্বেতবিন্দু সমন্বিত সজারুর কাঁটা দিয়ে তিনবার স্ত্রীর কেশ-বিভাগ করে সিঁথি কেটে দেবেন স্বামী। অবশ্য সিঁথি কাটার ব্যাপারটা অনুষ্ঠানের শেষাংশ। তার আগে মন্ত্র আছে অনেক, যার অনেকগুলোই হোম করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করে উচ্চারণ করবেন স্বামী। মন্ত্রগুলির একাংশ ধাতা অর্থাৎ বিধাতার উদ্দেশ্যে, যে বিধাতা এই বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি গর্ভিণীর গর্ভস্থ শিশুকে জীবন দিয়ে এই সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে তার পরম্পরা বন্ধন করবেন — ওঁ ধাতা দধাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্। সীমন্ত-কর্মে প্রচলিত মন্ত্রভাগের দ্বিতীয় অংশ 'রাকা' নামক (রাকা মানে চন্দ্র) দেবতার উদ্দেশে হলেও মন্ত্রবর্ণের মধ্যে গর্ভিণী স্ত্রী এবং চন্দ্রমা যেন একাত্ম হয়ে যান। মন্ত্রভাগের তৃতীয়াংশে ভগবান বিষ্ণুকে বলা হয় — তিনি যেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রূপটি দিয়ে গর্ভস্থ শিশুটিকে তৈরি করেন — ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং ন্যার্য্যাং গবীন্যাম্ পুমাংসং পুত্রমাধেহি।

আপাতদৃষ্টিতে সীমন্ত-কর্মের অনুষ্ঠানটুকু খুব সাধারণ এবং বোকা বোকা লাগতে পারে, কিন্তু এই কর্মের তাৎপর্য এবং ইঙ্গিত ফল যতটুকু গৃহ্যসূত্রগুলি এবং অন্যান্য উচ্চার্য্য মন্ত্রগুলির মধ্যে সূত্রিত হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ গর্ভধারণ কালের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটুকুই সম্ভাব্য জননীর কাছে সবচেয়ে আনন্দজনক হয়ে ওঠার কথা। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিতে কুসংস্কারের ভাগ যতটুকু আছে, তা আশ্বলায়নের স্মৃতিতেই বলা আছে। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন — রক্তপিপাসু রাক্ষসী-পিশাচীরা সব সময় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা পত্নীর প্রথম গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে খেয়ে নেবার জন্য সদা-সর্বদা তৎপর — পত্ন্যাঃ প্রথমজং গর্ভম্ অত্তুকামাঃ সুদুর্ভগাঃ। এই সব পিশাচী-রাক্ষসীদের তাড়ানোর জন্যই সীমন্তোন্নয়ের মাধ্যমে লক্ষ্মী-শ্রীকে আবাহন করতে হয় — সীমান্তকরণী লক্ষ্মীস্তামাবাহতি মন্ত্রতঃ।

আশ্বলায়ন-স্মৃতি গর্ভিণীর বিষয়ে এই দুর্ভাবনাগুলির সূত্র লাভ করেছে পুরাণগুলি থেকে। পুরাণ বলেছে — বিরূপ আর বিকৃতি নামে দুই রাক্ষস আর রাক্ষসী আছে। তারা থাকে বড়ো বড়ো গাছে, গুহায়,

পরিত্যক্ত বাড়িতে। তারা সব সময় গর্ভিণী রমণীর খোঁজে থাকে। গর্ভিণী যেন কখনো ওই সব জায়গায় না যান। গেলে, ওই গর্ভহন্তা রাক্ষস-রাক্ষসীর দুই ছেলেমেয়ে — যাদের নাম বিঘ্ন এবং মেহিনী — তাদের মধ্যে ছেলেটি গর্ভে প্রবেশ করে ভ্রূণটিকে খেয়ে নেয় আর মোহিনী সেই গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভপাত ঘটায়।

আমরা বুঝতে পারি, সেকালের দিন বহুল পরিমাণ গর্ভপাত ঘটত বলেই পৌরাণিকেরা কতগুলি বিধান দিয়েছেন এবং তা দিয়েছেন ধর্মীয় প্রবচনের মাধ্যমে, যাতে কোনোভাবেই গর্ভিণী রমণীরা সেই সব নির্দেশ অতিক্রম না করেন অথবা অন্যেরাও যাতে সেই নির্দেশ পালনে গর্ভিণী রমণীকে বাধ্য করেন। এর মধ্যে বৈদ্যশাস্ত্রীয় যুক্তিও কিছু আছে এবং তাও মিশে গেছে এই সব পৌরাণিক ধর্মীয় নির্দেশের সঙ্গে। সুশ্রুত বলেছেন — গর্ভলাভ সুস্থিরভাবে জানার পর রতিক্রীড়া এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম একেবারেই নিষিদ্ধ। দিনে ঘুমোনো চলবে না, রাত্রে জেগে থাকাও চলবে না। রথারোহণ, অশ্বারোহণ বারণ। গর্ভিণী যাতে ভয় পান এমন কাজ করা এবং এমন স্থানে যাওয়া একেবারেই অনুচিত। এ ছাড়া এই অবস্থায় অন্য কারণে শল্যচিকিৎসাও বারণ, কারণ তাতে রক্ত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়া প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি, সেগুলিও অস্বাভাবিক হলে তার চিকিৎসা করাতে হবে।

গর্ভলাভের পর থেকেই উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে ভাবনা করতে বলেছেন সুশ্রুত, পুরাণগুলির মধ্যে সেইগুলিই আরও বিস্তারিতভাবে প্রায় ধর্মীয় নির্দেশের আকার ধারণ করেছে। গোলকার বস্তুর ওপর না বসা, কারণ তাতে পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, নদীতে স্নান না করা, লোকপরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়িতে না যাওয়া — কারণ তাতে ভয় পাবার সম্ভাবনা — এইসব সামান্য নির্দেশের সঙ্গে বাড়িতে ঝগড়াঝাটি না করা, গালমন্দ না করা, খিমচা-খিমচি না করা — ইত্যাদি ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন পৌরাণিকেরা। অতি- পরিশ্রম কমানোর জন্যই হয়তো ধানের তুষ, কয়লা, ছাই — এ সব স্পর্শই করতে বারণ করা

হয়েছে গর্ভিণীকে। কারণ এগুলি স্পর্শ না করায় ধর্মীয় নির্দেশ থাকার ফলেই হয়তো ধান-ভানা, আগুনের কাছে বেশি না যাওয়া বা ছাই দিয়ে বাসন-মাজার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতেন গর্ভিণীরা।

বলতে পারেন — এইসব পৌরাণিক এবং বৈদ্যক নিষেধের সঙ্গে সীমন্তোন্নয়নের মতো একটি সংস্কারের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক একটা আছে। আসলে সীমন্ত কর্মের সাংস্কারিক প্রক্রিয়া প্রায়শই গর্ভলাভের পাঁচ ছয় মাস পরেই অনুষ্ঠিত হয়। সুশ্রুতের বৈদ্যক মতে অথবা তাঁর বিশ্বাসে. গর্ভস্থ ভ্রূণের মন তৈরি হতে থাকে গর্ভের পঞ্চম মাস থেকে এবং তার বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষমাত্র ঘটতে থাকে ষষ্ঠ মাস থেকে — পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ। অতএব এইসব সময় থেকে গর্ভিণীকে শারীরিক এবং বিশেষত মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখার দায়িত্ব আসত গৃহের সকলের এবং অবশ্যই প্রধানত স্বামীর। ওই যে আশ্বলায়ন স্মৃতি বলেছে — এই সময়ে রাক্ষসী-পিশাচীরা ঘোরাফেরা করে গর্ভে প্রবেশ করে ভ্রূণ গ্রাস করার লোভে — এই কুসংস্কারের পিছনে কারণ একটাই — গর্ভিণী যাতে সাবধান থাকেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম বা অন্যান্য অত্যাচারের ফলে যাতে গর্ভপাত না ঘটে।

আবার মানসিক দিক থেকে এই সীমন্তোয়ন সংস্কার যে গর্ভিণীকে অনেকটাই উৎফুল্ল করে তুলত, তা এই সংস্কারে উচ্চার্য মন্ত্রগুলি থেকেও যথেষ্ট বোঝা যায়। গর্ভধারণ কালে নারী শরীরে যতই উচ্চাবচ বিকার দেখা যাক, সেই সময়ে ভাবী সন্তানের জননী হবার জন্য তাঁর শরীরের মধ্যে স্নিগ্ধ প্রসাদ ও লাবন্য সংযুক্ত হয়। সীমন্ত-কর্মোদ্যোগী স্বামী এই প্রসাদ বিস্মৃত হন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করেন চান্দ্রমসী জ্যোৎস্নার সাজাত্যে — রাকামহং সুহবাং সুষ্ঠুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীমোন্তোন্নয়নের সময়ে পক্ক উদুম্বর ফল এবং সজারুর কাঁটা দিয়ে স্বামী যখন গর্ভিণী স্ত্রীর কেশবিভাগ করেন তখন গর্ভিণী তাঁর আপন সাংসারিক এবং সামাজিক গুরুত্ব সম্বন্ধে, সচেতন হতে থাকেন। এক স্তবক উদুম্বর ফল আসলে 'ফার্টিলিটির পরিচায়ক। শুধু কেশ বিভাগ

নয়, ব্রাহ্মণ সর্বস্বের বাঙালি লেখক হলায়ুধ মিশ্র বলেছেন — পূর্বোক্ত পুংসবনের সময় হিরণ্যগর্ভ সূক্ত উচ্চারণ করে ত্রৈলোক্যপতি এবং ত্রৈলোক্যের আধার পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেই যেন গর্ভে আহিত করেন স্বামী। স্ত্রী তখন এই ত্রিলোকের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেন — এতাবতা গর্ভিণীয়ং ত্রৈলোক্যময়ী ভবতি। এরপর সীমন্তোন্নয়নের সময় স্বামী স্ত্রীকে উদুম্বর ফল স্পর্শ করিয়ে শুধু কেশ বিভাগমাত্র করে ছেড়ে দেবেন না। তিনি সযত্ন সান্নিধ্যে স্ত্রীর চুলও বেঁধে দেবেন — সীমান্তোন্নয়নেন পৃথক্‌কৃতৈঃ কেশৈঃ বেণীং দধাতি।

চুল বেঁধে দেবার সময় স্বামী মন্ত্র পড়ে বলবেন — এই বলবান বৃক্ষ যেমন উদুম্বরী ফলাযুক্তা, তুমিও তেমন পুত্ররূপ ফলের জন্য সংযুক্ত হও — অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভব। স্বামীর সান্নিধ্যের সঙ্গে তাঁর পূর্বলালিত আকাঙক্ষাপূরণের মাধ্যম হিসাবে একজন গর্ভিণী স্ত্রীর প্রতিষ্ঠাই হল সীমন্তোন্নয়নের প্রধান তাৎপর্য। অন্তত এই মুহূর্তে সেকালের সমাজ শাসক পুরুষও স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য যে চেষ্টা করতেন, সীমন্ত - কর্ম তারই প্রকাশ। লক্ষণীয়, সীমন্ত-সংস্কারের শেষ পর্বে গীতবাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। বীণাবাদকরা বীণার তার বেঁধে অপেক্ষা করতেন, সংস্কার পর্বের শেষে তাঁদের ডাক পড়ত। তাঁরা দেবতাদের প্রথম রাজা সোমের (চন্দ্রের) উদ্দেশ্যে গান ধরতেন আর তাঁদের সঙ্গে স্বামী স্বয়ং গানের কলি ধরতেন — সোম এব নো রাজেমা মানুষীঃ প্রজাঃ।

স্ত্রীর এই মনোরঞ্জনের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে গর্ভিণী স্ত্রীকে সাধ দেবার রীতি তৈরি হয়েছিল। সাধ মানে ইচ্ছাপূরণ, স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ পূরণ করা। প্রাচীনেরা এর নাম দিয়েছিলেন 'দোহদ' বা 'দৌহৃদ'। কট্টর স্মার্ত হওয়া সত্ত্বেও যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ব্যক্তিও বিধান দিয়েছেন — তস্মাৎ কার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রীয়ঃ — অর্থাৎ এই সময়ে স্ত্রীর প্রিয়কার্য সাধন করবে। সমাজের শাসক পুরুষ যদি এ-কথা না মানেন, যদি আদিখ্যেতা মনে করেন এই ইচ্ছাপূরণের স্বাভাবিকতাকে, যাজ্ঞবল্ক্য তখন ভয় দেখিয়ে বলেছেন — যদি এই সময়ে স্ত্রীর ইচ্ছাপূরণ না করো তবে দোষ লাগবে তোমার স্ত্রীর

গর্ভে। আসলে এও সেই গর্ভিণীর মনের দিকে তাকানোর চেষ্টা। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন গর্ভিণীর শান্ত এবং প্রসাদিত মনই উত্তম সন্তানের প্রসূতি ঘটায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতক্ষণ যতগুলি সংস্কারের কথা বলেছি — গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি — এগুলি সবই সন্তান-জন্মের পূর্বকরণীয় সংস্কার। তার মানে, পুত্র বা কন্যার জন্মের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্তই নয়, সন্তান যেদিন থেকে গর্ভে আহিত হবে, সেই দিন থেকেই তাকে একটি উৎকৃষ্ট সন্তানে পরিণত করবার জন্য চেষ্টা করতেন প্রাচীনেরা। হতে পারে, এর মধ্যে অনেকটাই বিশ্বাস আর কুসংস্কার, হয়তো বা অনেকটা বিস্ময়ও, কিন্তু একটি সুসন্তান লাভের জন্য প্রাচীনদের এই চেষ্টাটুকু আমাদের কৌতূহলী করে।

জাতকের জন্মের আগে আরও দু-একটি সংস্কার আছে, যেখানে সুখপ্রসবের জন্য মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, তবে সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরঞ্চ বলা উচিত সেগুলি প্রসবসংক্রান্ত কর্ম। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা মূল গৃহ হতে দূরে তৈরি করা আতুর ঘর বলে একটা জায়গা দেখতাম, যেখানে পুত্রার্থিণী গর্ভিণীর অস্থায়ী আবাস নির্দিষ্ট হত। এখন বুঝি, সে আবাস খুব স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না এবং তাতে জায়গাও থাকত খুব কম। প্রাচীনেরা কিন্তু এমন বিধান দেননি। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ তো রীতিমতো 'আর্কিটেক্ট' ডেকে সমতল ভূমিতে একটি সুরম্য সূতিকা-ভবন নির্মাণ করতে বলেছে — সুভূমৌ নির্মিতং রম্যং বাস্তুবিদ্যাবিশারদৈঃ। কিন্তু পরবর্তী কালে এ-সব কিছুই না মেনে শুধু ছুঁয়ো-না ছুঁয়ো না করে সূতিকাগৃহের স্বাস্থ্যটুকুই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

যাই হোক, পৌরাণিক নিয়মে সম্ভাব্য প্রসবের দু-এক দিন আগেই দেবদ্বিজের পূজা হবার পর বাদ্যি-বাজনা শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই সূতিকা ভবনে প্রবেশ করতেন গর্ভিণী। এরপর যখন প্রসব-যন্ত্রণা শুরু হত, তখন গর্ভিণীর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে স্বামী যে মন্ত্র পড়তেন তার অর্থ হল — তুমি এবার বহির্গত হয়ে এই পৃথিবীর

মুখ দেখো। তবে তুমি একা নও, আসবার সময় তোমার গর্ভবেষ্টনী জরায়ুটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসো। ঠিক যেমন কম্পিত হয় সমীরণ, যেমন কম্পিত হয় সমুদ্র, তেমন করেই নির্গত হও তুমি।

মূল কথাটা হল — 'এজতু' অর্থাৎ চলমান হও, হাওয়ার মতো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। প্রসববেদনার তরঙ্গের সঙ্গে হয়তো এই উপমাগুলির মিল আছে এবং গর্ভস্থ সন্তান প্রসূত হবার সময় কোথাও যেন বাধা না পায়। দেহান্তর্গত পুষ্টমাংস বা মেদবহুলতায় যাতে জরায়ুসহ সন্তানের বহির্গমন রুদ্ধ না হয়, সেজন্যও অথর্ববেদের মন্ত্র পড়েছেন স্বামীরা — নৈব মাংসেন পীবরী ন কস্মিংশ্চনায়তমব জরায়ু পদ্যতাম্। জরায়ু বলতে যে এখানে কোনোভাবেই আক্ষরিকার্থ বোঝাচ্ছে না এবং 'প্ল্যাসেন্টা'ই যে এখানে অভীষ্ট অর্থ সেটা ওই একই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পৃশ্নি' শব্দটা থেকে বোঝা যায়। 'পৃশ্নি' মানে বাংলায় পানা, পুকুরের পানা, শ্যাওলা, জলজ পর্ণ। পানা যেমন জলে ভাসে, তার মূল যেমন অদৃঢ় প্রোথিত এবং তা যেমন সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, অথর্ববেদ বলেছে ঠিক তেমন করেই যেন জরায়ু অর্থাৎ 'প্লাসেন্টা'ও বেরিয়ে আসে — অবৈতু পৃশ্নি শেবলং শুনে জরায়ুরত্তবে।

খবরের কাগজে একবার পড়েছিলাম — এন.আর.এস হাসপাতালে নাকি প্রচুর 'প্ল্যাসেন্টা'-লোভী কুকুর ঘুরে বেড়ায়। এই কুকুর নাকি 'প্ল্যাসেন্টা' খেতে এসে একটি শিশুকেই কামড়ে দিয়েছিল। আমার ধারণা, এই হাসপাতালের সূতিকা বিভাগ এখনও অথর্ববেদের 'ট্রাডিশন' মেনে চলে। অথর্ববেদ বলেছে — জলের উপরিভাগে স্থিত শৈবালের মতো 'প্ল্যাসেন্টা' বেরিয়ে আসুক সহজে। কেন? না, সেটা থাকবে কুকুরের ভোজনের জন্য — শুনে জরায়ুঃ অত্তবে। সত্যি, সবই ব্যাদে আছে, এখনও এই একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসেও আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত হাসপাতালে কুকুরদের সেই ভোজন উৎসব চলে। যাই হোক, গর্ভযন্ত্রণার আরম্ভ থেকে একেবারে প্রসব পর্যন্ত যে সব গুরুত্বহীন সংস্কার-কর্মের কথা আমরা বললাম, এগুলির একাংশের নাম সোষ্যন্তীকর্ম এবং

অবরাপতন। শেষোক্ত অবরাপতন নামটি থেকেও বোঝা যায় জরায়ুর নির্গমন বলতে প্রাচীনেরা 'প্ল্যাসেন্টা'ই বুঝেছেন, কেননা 'অবরা', 'অমরা' ইত্যাদি শব্দ বাংলায় 'প্ল্যাসেন্টার'ই প্রতিশব্দ'। হলায়ুধ মিশ্র 'জরায়ু' বোঝাতে 'আঁয়ল' নামে একটি দেশি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের পর্যায়ে কোনো সময় 'প্ল্যাসেন্টা' অর্থে আঁয়ল শব্দের প্রয়োগ হত, ভাষাতাত্ত্বিকেরা তা ভেবে দেখবেন। তবে এটা যে সংস্কৃতে ব্যবহৃত গর্ভাবরক 'উল্ব' শব্দের প্রতিভূ তাতে সন্দেহ নেই।

৪। জাতকধর্ম:

গর্ভ থেকে শিশুর নিষ্ক্রমণের পর থেকেই সংস্কারগুলির আরও এক পর্যায় শুরু হয়। যে শিশু জন্মাল যে যদি কন্যা হত, তাহলে সেই কন্যার জন্ম যে সব সময়েই পিতা-মাতার জীবন নিরানন্দ করে তুলত, এমন উদাহরণ আমরা ভূরি ভূরি দিতে পারব না। তবে হ্যাঁ, পুংশিশুই যে প্রাচীনদের কাছে একান্ত আকাঙ্ক্ষিত ছিল এবং কন্যার জন্মও যে নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল, সেই প্রমাণই ভূরি ভূরি আছে এবং প্রাচীন যুগে তা ছিল স্বাভাবিক। তখনকার দিনে যুদ্ধের জন্য নিজেদের গোষ্ঠী ছড়িয়ে দেবার যে ভাবনা স্বাভাবিক ছিল, এখন তা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু অতি-আধুনিক যাঁরা, যাঁরা কথায় কথায় প্রগতির কথা বলেন, তাঁরা কেন কন্যার জন্মে হতাশ হন?

সত্যি কথা বলতে কী মনস্তত্ত্বের পাঠটুকু এখানে সবচেয়ে বড়ো। বিবাহ দেবার ভাবনা এবং সে জন্য অর্থের ভাবনা — এই সব অবান্তর ভাবনার চেয়েও বড়ো কথা হল — কন্যা শেষ পর্যন্ত পিতা-মাতার কাছে থাকে না। সন্তানের মাধ্যমে যে অহং এবং মমতার পুষ্টি হয়, কন্যা সেই পুষ্টি দিতে পারে না। কালিদাসের মতো সংবেদনশীল কবি পর্যন্ত লিখেছেন — কন্যা মানেই সে আমার নয়, সে পরের — অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব। জন্মমাত্রেই এই বিষাদ পিতামাতাকে আকুলিত করে বলেই, কী প্রাচীন

কী আধুনিক প্রত্যেকেই বিষাদিত হন। কিন্তু কন্যাজন্মের মতো কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে প্রাচীনেরা কন্যা বর্জনও করতেন না কিংবা তাদের মেরেও ফেলতেন না। প্রাচীন সংহিতার প্রমাণ দিয়ে দু-একজন সাহেব এই রকম কল্পিত ব্যাখ্যা করেছেন এবং অল্পশ্রুত কিছু 'সোশিওলজিস্ট'ও তাঁদের মাথায় নিয়ে নেচেছেন, কিন্তু এরা প্রাচীন তথ্য জানেন কম, কিন্তু বলেন বেশি।

কোনো সন্দেহ নেই যে, কন্যার জন্ম হলে পিতা-মাতার মন বিষণ্ণ হত এবং এই বিষাদের প্রতিফলন ঘটেছে সংস্কারের মধ্যেও। তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি মন্ত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কন্যা সন্তান জন্মালে শিশুটিকে একপাশে শুইয়ে রাখা হত, আর পুত্র জন্মালে তাকে তুলে নেওয়া হত। এই শুইয়ে রাখা এবং তুলে নেওয়ার মধ্যে প্রতীকীভাবে যে প্রাথমিক বিষাদ-আহ্লাদের সূচনা আছে, সাহেবরা এবং তাঁদের অনুগামীরা সেটাকেই বর্জন-গ্রহণের তাৎপর্যে গ্রহণ করেছেন। প্রাচীন সংহিতায়, মহাভারতে, রামায়ণে কোথাও আমরা কন্যা বর্জনের বা কন্যাহত্যার কথা পাইনি। অপিচ এঁরা বোঝেন না যে, পুত্র-সন্তান জন্মালেই তার জাতকর্ম সংস্কার করতে হত এবং কন্যা জন্মালে এই সংস্কার হত না এমন নয়। অতএব তাকে একপাশে শুইয়ে রাখার যে রীতি ছিল, সেটা শুধুই বিষাদের প্রতীক। তার ভাবটা এই নয় যে — এর তো সংস্কারের প্রয়োজন নেই, অতএব শুয়ে থাক।

পুরুষ-শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই পিতা যেহেতু বংশের পারম্পর্য রক্ষা এবং নিজের অহং-মমত্বের তুষ্টিসাধন করতে পারতেন, অতএব সঙ্গে-সঙ্গেই তার সংস্কার আরম্ভ হত এবং এই সংস্কারের নাম জাতকর্ম। দোষ অপনয়ন অথবা গুণাধান যদি সংস্কারের লক্ষণ হয় তবে জাতকর্মের মাধ্যমে দুটিই ঘটত বলে মত প্রকাশ করেছেন হারীত এবং পারস্কর। হারীত বলেছেন — পিতা-মাতার শুক্র-শোণিত এবং গর্ভসংক্রান্ত সমস্ত দোষ জাতকর্মের দ্বারা দূরীভূত হয়। আর পারস্কর গৃহ্যসুত্রের মতে — জাতকর্ম সংস্কার পুত্রের মেধা আর আয়ু বাড়ায়।

আভিধানিক অর্থে জাতকর্ম হল — পুত্র জাত হলেই যে কর্ম করতে হয়। একেবারে সুপ্রাচীন কালে পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ি কাটার আগেই জাতকর্ম বিহিত ছিল — প্রাঙ্‌নাভিবন্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে। তবে জাতকর্মের প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রাচীনকালে যা ছিল, পরবর্তী কালে তার পরিবর্তন ঘটেছে নিশ্চয়। যে তৈত্তিরীয় সংহিতায় কন্যাশিশু জন্মালে শুইয়ে রাখার কথা এবং পুত্র জন্মালে কোলে তুলে নেবার কথা বলা হয়েছে, সেখানে দেখতে পাচ্ছি — পুত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে পিতা বারোটি মৃৎপাত্রে রক্ষিত পিঠের মতো কোনো খাদ্যদ্রব্য বৈশ্বানরের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে যাগ করতেন। এতে নাকি পিতার ধন, ধান্য এবং বলের বৃদ্ধি হত। অন্যদিকে শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে — পুংশিশুর নাড়িচ্ছেদের আগেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ নবজাত পুংশিশুটিকে আঘ্রাণ করবেন। অভাবে পিতাই এ কাজ করবেন। তবে বাস্তব কারণেই এই বিধান চলেনি। হয়তো আর্যখণ্ডের কোনো প্রজাতির মধ্যে এই নিয়ম চালু ছিল।

জাতকর্মের সবচেয়ে সুন্দর প্রথাটি চিত্রিত বৃহদারণ্যক উপনিষদে এবং ওই উপনিষদ সারাংশই পরবর্তী কালের স্মার্ত সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্তও হয়েছে। বৃহদারণ্যকে জাতকর্মের প্রধান দিকটি হল — পুত্রজন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই শিশুর মুখে এক ফোঁটা গব্য ঘৃত দিয়ে চাটানো হত এবং তাবপরে মায়ের স্তন্য পান করতে পেত শিশু — তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈ প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি। বৃহদারণ্যকে জাতমর্মের যে বিস্তার আছে তার প্রধান অঙ্গগুলি হল — (১) দধি-ঘৃত সহযোগে একটি সমন্ত্রক হোম। (২) নবজাত পুত্রের কানে তিনবার 'বাক' শব্দটি উচ্চারণ করতেন পিতা। জন্মলগ্নেই এই শব্দ তিনবার উচ্চারণ করে তিন বেদ অথাৎ জ্ঞানকে পুত্রের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতেন পিতা। (৩) একটি সোনার আংটির সাহায্যে পিতা দই-ঘি মধুর মিশ্রণ পুত্রের মুখে দিতেন তার মেধা এবং আয়ুবৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে। (৪) জন্মলগ্নেই একটি গুপ্ত নাম দেওয়া হত শিশুকে। (৫) এরপর শিশুকে মাতৃস্তন্য পানে সমন্ত্রে প্রবৃত্ত করতেন পিতা।

(৬) বীরপুত্রপ্রসবিণী জননীকে সমন্ত্রক অভিনন্দন জানাতেন স্বামী।

গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার কোনো কোনো অংশ আছে আবার কোনোটি বাদও গেছে, বিশেষত জননীকে অভিনন্দনের ব্যাপারটা বাদ গেছে অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রে। উপনিষদ এবং গৃহ্যসূত্রগুলির সমস্ত পরম্পরা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে জাতকর্মের রূপ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে প্রথমেই একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে পুত্রমুখ দর্শন করে পিতা স্নান করে আসতেন, তারপর সোনার কাঠিতে ঘি-মধু নিয়ে পুত্রের মুখে দিতেন পুত্রের শতায়ু কামনায় মন্ত্র বলতেন — দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে এই পৃথিবীতে তুমি শত শরৎ জীবিত থাকে — আয়ুষ্মান গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং জীব লোকে অস্মিন্।

আয়ুষ্কামনায় সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র যাতে মেধাবী হয় তাও কামনা করা হত মন্ত্র পড়ে। উপনিষদের মধ্যে শিশুকর্ণে যে 'বাক্' শব্দ উচ্চারণের প্রথা ছিল, সেটা পরবর্তীকালের ছন্দোবন্ধে মেধা-জন্মানোর মন্ত্রে পর্যবসিত হয় এবং মেধা চাওয়া হয়েছে জ্যোতিস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সূর্যের কাছে, বাক্‌রূপিণী সরস্বতীর কাছে — ওঁ মেধাং তে দেবঃ সবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী।

এই আয়ুষ্কামনা এবং মেধা-জন্মানোর মন্ত্র পরবর্তীকালে পৃথক দুটি সংস্কারে পরিণত হয়েছে যার নাম 'মেধাজননায়ুষ্যকর্ম'।

পুত্রের মেধা আর আয়ুষ্কামনা করে নবজাতকের কানে কানে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন পিতা, সে সব মন্ত্রের চমৎকারিতা শিশুপুত্রের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই সব মন্ত্র নবজাতককে এক মুহূর্তের মধ্যে যেন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গলোকের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে — ওঁ ভূস্ত্বয়ি দধামি, ভুবস্ত্বয়ি দধামি, স্বস্ত্বয়ি দধামি। শুধু তাই নয়, মন্ত্রের মাধ্যমে পিতাও একাত্ম হন পুত্রের সঙ্গে। তিনি বলেন — আমি যেমন তোমাকে জানি তুমিও সেটা জানো, আমরা একসঙ্গে শত শরতের শোভা দেখব, একসঙ্গে শত শরৎকাল বাঁচব, এক সঙ্গে শত শরৎ পরস্পরকে শ্রবণ করব — পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্। শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।

যে শিশু কিছুই বোঝে না, তার কানে কানে এত কথা বলে নবজাতক শিশুটিকে পিতা যেভাবে আত্মীকরণ করেন, তার তীব্রতা অকল্পনীয়। শেষে ছোটো শিশুটির কাঁধে হাত রেখে আশীর্বাদ করেন পিতা — পাথরের মতো কঠিন শরীর হোক তোমার। কুঠারের মতো আমার বিরোধীদের ছেদন করো তুমি। পুত্র! আমিই তুমি হয়ে জন্মেছি, তুমি একশো বছর বেঁচে থাকো — আত্মা বৈ পুত্রনামামি স জীব শরদঃ শতম্।

ভাবুন এতগুলি মন্ত্র কিন্তু নাড়ি কাটার আগেই। পিতা পুত্র এবং তার জননী এইভাবে একাত্ম হয়ে ওঠার পরেই জননীর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হত শিশুকে। শিশুর মুখে জননী তখন প্রথমে দক্ষিণ স্তন প্রদান করতেন, তারপর দ্বিতীয় স্তন। জননীর সেই শতধার দুগ্ধও তখন পিতার মুখোচ্চারিত মন্ত্রে পুত্রের আয়ু বল এবং যশের প্রতীক হয়ে উঠত — অস্মৈ স্তনৌ প্রযুঞ্জানা আয়ুর্বর্চো যশো বলম্।

জাতকর্মের প্রক্রিয়ার মধ্যে আরও একটি অসাধারণ অঙ্গ হল জন্মদাত্রী মাতার অভিমন্ত্রণ। অভিমন্ত্রণ মানে প্রশংসা। একালের দিনে জন্মদাত্রী রমণীকে শাড়ি-গয়নার উপহার দিয়ে তুষ্ট করতে দেখি স্বামীদের। সেকালের দিনে উপহার দেবার প্রথা ছিল না বটে তবে পুরুষ-শাসিত সমাজে এবং হয়তো বা একটি পুরুষের জন্ম দেবার জন্যই সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে স্ত্রীকে অভিনন্দন করতেন স্বামীরা। অভিনন্দনের মন্ত্রে পুত্রের জননী দেবমাতা ইলা এবং মিত্রাবরুণের কন্যার সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হন। স্বামী তাকে দেবী সম্বোধন করে একজন বীর রমণীর সম্মান দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন — তুমি বীরের জন্ম দিয়েছ। এইভাবে তুমি যেমন বীরের জননী হয়েছ, তেমনই আমাকেও এক বীর পুত্রের পিতা হতে সাহায্যে করেছ — বীর বীরমজীজনথাঃ। সা ত্বং বীরবতী ভব যা'স্মান্ বীরবতো'করোৎ।

৫। নামকরণঃ

জাতকর্মের সমস্ত উচ্ছ্বাসের পরেই আসে নামকরণের সংস্কার। এখনকার দিনে আমরা প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় পুত্র-কন্যার নামকরণ করতে দেখি এবং সে নামটি পিতা-মাতা এবং অন্যান্য পরমাত্মীয়ের আলোচনাক্রমে নিশ্চিত হয় বলেই নামকরণে বিলম্ব হয়। অতএব অন্নপ্রাশনের সময় ছাড়া গতি থাকে না। কিন্তু সেকালের দিনে নাম ভাবতে হত অনেক আগে থেকেই এবং বেশিরভাগ শাস্ত্রকারদের মতে নামকরণ করা হত পুত্র-কন্যার জন্মের দিনেই। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ প্রচুর। কেউ জন্মের দিন থেকে দশ দিনের মাথায়, কেউ এগারো, বারো অথবা ষোলো দিনের মাথায়, আবার কেউ বা বত্রিশ দিনের মাথায় নামকরণের বিধান দিয়েছেন। এমনকী জন্মদিন থেকে একশো দিন, এমনকী এক বছর পার করার বিধানও বাদ যায়নি।

এত মতভেদের পেছনে কারণও অনুমান করা যায় অনেক। মনে রাখা দরকার, নামকরণ সংস্কার যেহেতু এককভাবে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং যেহেতু তা সর্বজনীন, অতএব পুত্র-কন্যার জন্মের পরে যে জননাশৌচ চলত, বিভিন্ন জাতির অশৌচক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুযায়ী সেই অশৌচের পরেই নামকরণের অনুষ্ঠান হত। আবার যেখানে একশো দিন, কী এক বছর পরে নামকরণ হচ্ছে, সেখানে বুঝতে হবে নবজাতকের অসুখ-বিসুখ, অন্যান্য অশৌচ-কাল পড়ে যাওয়ার ঘটনা। পিতার প্রবাস — ইত্যাদি অনেক কিছুই কল্পনা করা যেতে পারে। তবে সব কিছুর ওপরে একটা কথা ঠিক যে, নামকরণের সময় শাস্ত্রসম্মতভাবে এতটা দীর্ঘায়িত হওয়ার পিছনে কারণ একটাই — পুত্র-কন্যার নামকরণ নিয়ে বেশ ভাবনা-চিন্তা করা হত এবং তাতে সময় চলে গেলেও পিতা-মাতার দিক থেকে সাংস্কারিক কোনো সমস্যা তৈরি হত না।

সংস্কার শব্দটির লক্ষণ মিলিয়ে — অর্থাৎ সেই গুণাধান বা দোষনাশের কথা ভেবে যদি নামকরণের তাৎপর্য খুঁজি, তাহলে শাস্ত্রকারেরা

শতপথ ব্রাহ্মণের উদাহরণ দেখিয়ে বলতে পারেন যে নামকরণের ফলে নবজাত পুত্রের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায় — জাতস্য নাম কুর্য্যাৎ পাপ্সানমেবাস্য তদ্ অপহন্তি। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব এবং বেশ কিছু গৃহ্যসূত্রের মধ্যে দেখা যায় যে, পুত্র-কন্যার জন্মের পরেই তাদের ওপর অশরীরী রাক্ষসী-পিশাচী বা প্রেতাত্মার আবেশের ভয় পেতেন পিতা-মাতা। অতএব অদ্ভুত শব্দে আকীর্ণ কতগুলি উচাটন-মন্ত্র পড়ে সে-সব বালগ্রহ (যারা বাচ্চা ধরে, বাচ্চাদের ওপর ভর করে) তাড়িয়ে দিয়ে পুত্র-কন্যার নামকরণ করতেন পিতা। পিতা ভাবতেন, নামকরণ করে দিলেই সেই শিশুটি আর অরক্ষিত রইল না। একটি নামের আবরণে শিশুটিকে যেন সমস্ত আগন্তুক বিপদ থেকে সুরক্ষিত করা হল। এই কারণে কখনো একটি, দুটি, এমনকী তিনটি নামও রাখা হত।

নামকরণের পিছনে যে মনস্তত্ত্ব বা দার্শনিকতা ছিল প্রাচীনদের তা হল নবজাতকের 'আইডেনটিফিকেশন', তার একটি প্রতীকী পরিচয় সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা। বৈয়াকরণ পতঞ্জলি লিখেছেন — মাতা-পিতা যে নির্জন ঘরের মধ্যে বসে পুত্রের নামকরণ করেন — দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি, আসলে সেটা তার সংজ্ঞা। পিতা-মাতার ওই নামকরণ থেকেই অন্যেরা শিশুটিকে চিনতে পারে। নামকরণের তাৎপর্য এই সংজ্ঞার মধ্যেই। স্মার্ত বৃহস্পতি এই কথাটাই বলেছেন আরও সহজ করে। তিনি বলেছেন — লোকসমাজ একজনকে পৃথক এবং এককভাবে চিহ্নিত করাটাই নামকরণের কারণ — নামাখিলস্য ব্যবহারহেতুঃ। নাম মঙ্গল এবং ভাগ্য বয়ে আনে। নামের মাধ্যমেই মানুষ কীর্তি লাভ করে। নামকরণ করাটা তাই প্রশস্ত কর্ম।

এত প্রশস্ত হলেও এটা বলতে হবে যে, নামকরণ ব্যাপারটা সৃষ্টির আদি কাল থেকেই খুব স্বাভাবিক সহজ এবং অবধারিত বলেই নামকরণের সময় কোনো বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয় না — নামকর্মণি তু বৈদিকমন্ত্রৈ রনুষ্ঠানং পারস্করেণ নোপদর্শিতম্। স্মার্তরা অনেকেই তাই নামকরণ নিয়ে এত মাথাও ঘামাননি। নামকরণের অনুষ্ঠান সেকালে যা হত, তা অনেকটাই

লৌকিক ভাবনায় বিহিত। নামকরণের আগে মা এবং নবজাতক পুত্র দুজনকেই স্নান করতে হত। তারপর মা নবজাতককে নতুন বস্ত্রে আবৃত করে পিতার কোলে দিতেন। পিতা অন্যান্য নিত্যকর্ম সেরে পুত্রটির মাথায় কুশের জল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়তেন। এই মন্ত্রগুলি অবশ্য কোনোভাবেই নামকরণের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরঞ্চ এগুলি নবজাতককে পরিষ্কার করা এবং জল দিয়ে মার্জনা করার মন্ত্র। একেবারে সবার শেষে পুত্রটির উত্তরদিকে মাথা করে কোলে নিয়ে পিতা অথবা যিনি নাম দেবেন তিনি পুত্রের ডান কানের কাছে গিয়ে বলতেন — তোমার আজ থেকে এই নাম হল। অনেক ক্ষেত্রে এই পিতৃদত্ত নাম অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা অতিথিদের সামনে উচ্চারণ করে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হত। সেকালে নামকরণের অনেক স্মার্ত বিধি ছিল। ছেলে হলে দুই অক্ষর বা চতুরক্ষর নাম, মেয়ে হলে তিন অক্ষরের নাম দিতে হবে। ছেলে এবং মেয়ে — দুয়ের ক্ষেত্রেই নামকরণের কিছু বিধিনিষেধ ছিল, অর্থাৎ এই নাম দেওয়া যাবে, সেই নাম দেওয়া যাবে না — ইত্যাদি। নাম দেবার রীতিনীতি নিয়ে বেশ বড়ো একখানি প্রবন্ধই লেখা যায়। কিন্তু তার অবসর নেই এখানে।

৬। নিষ্ক্রমণ:

নামকরণের পরের সংস্কার হল নিষ্ক্রমণ। এই সংস্কারের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নতুন কোনো গুণের আধান করা বা অন্য কোনো বিশেষ ফলের কথা বলা নেই কোথাও। হলায়ুধ তাই লিখেছেন — বিশেষ ফলের কথা নেই বলেই যাজ্ঞবল্ক্য এখানে পিতার বীজ এবং মাতার গর্ভদোষ নিরসনের সাধারণ ফলের কথা বলেছেন। এখানেও তাই মানতে হবে। আমাদের ধারণা এটি নিতান্তই এক স্বাভাবিক সংস্কার। নিষ্ক্রমণ মানে বাইরে নিয়ে আসা। সূতিকাগৃহের অশৌচ শেষ হলে জননী যেহেতু সেই গৃহ ছেড়ে বাইরে আসেন এবং পুনরায় তাঁর সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে একত্র হন,

তেমনই শিশুটিরও তো এই প্রথম বাইরে আসা। এই প্রথম বাইরে আসার ব্যাপারটাই স্মরণীয় করে রাখা হত একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পিতা সেদিন শিশুটিকে কোলে নিয়ে সূর্য দেখাতেন। মন্ত্র পড়ে বলতেন — দেখো বৎস! এই সূর্যই হলেন তিন ভুবনের চক্ষুঃস্বরূপ। পূর্বদিকে দেবতাদের হিতকারী নিষ্কলুষ সূর্যের উদয় হয়েছে। চোখ ছাড়া যেমন কোনোকিছুই চাক্ষুষ দেখা যায় না, এই সূর্য ছাড়া এই জগতেরও প্রকাশ ঘটে না।

প্রথম দিনের সূর্য পিতৃক্রোড়ে লালিত নবতম সত্তাকে কোনো প্রশ্ন করত কি না জানা নেই, তবে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বৃহৎ পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রকাশ-বস্তুর সঙ্গে পুত্রের পরিচয় করিয়ে দিতেন পিতা। পুত্রের জ্ঞানোন্মেষণের জন্য এই হয়তো পিতার প্রথম প্রচেষ্টা। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, একটি অবোধ নবজাতকের কানে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাকে সূর্য দেখানোর পর পিতা যখন বলতেন — আমরা একশো বছর বাঁচব, একশো শরৎ দেখবো এবং একশো শরৎ পরস্পরের কথা শুনব — তখন বুঝি এগুলি পিতারই মনের সান্ত্বনা। একটি শুক্র-শোণিতের মিলনজাত শিশুকে উচ্চতর এক দেবমহিমায় প্রতিষ্ঠা করাই শুধু নয়, মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পিতা যে তাঁর পুত্রটির মধ্যে চিরন্তন জ্ঞান এবং বংশগত ঐতিহ্যের মূল প্রোথিত করার কথা ভাবতেন — এইসব সংস্কারের মনস্তত্ত্ব বোধহয় সেটাই।

৭। অন্নপ্রাশন:

এই সংস্কারের কথা সবাই জানেন এবং প্রায় সকলেই মানেন। মানেন, কেননা এর পিছনে যে বৈজ্ঞানিক কারণ আছে তা আজও সযৌক্তিক। অশন মানে খাওয়া। প্রাশন প্রকৃষ্টরূপে খাওয়া। অন্ন বলতে যেকোনো খাদ্যবস্তু বোঝালেও এখানে অন্ন মানে ভাত। শিশু আগে যেখানে মাতৃস্তন্য, জল অথবা গোরুর দুধ খেত, তার কাছে ভাত বা অন্য কোনো 'সলিড'

জিনিস খাওয়া মানেই প্রকৃষ্ট ভোজন অর্থাৎ 'প্রাশন'। অন্নের প্রকৃষ্ট ভোজনই অন্নপ্রাশন। শাস্ত্রমতে সংস্কারের লক্ষণ মেলালে অন্নপ্রাশনের দ্বারা শিশুশরীরে কোনো গুণাধান হয় বলে শাস্ত্রাকারেরা বলেননি, কিন্তু দোষাপনয়নের কথা বললে তাঁরা ওই একই কথা বলেন। অর্থাৎ রেতঃ, রক্ত, গর্ভোপঘাতের দোষ নাকি অন্নপ্রাশনের সংস্কারে নষ্ট হয়। আমরা এটা ভালো করে মানতে পারি না। বরঞ্চ সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি যে শিশু আগে মাতৃস্তন্য পান করত, তাকে শক্ত খাবার অভ্যাস করানোর প্রারম্ভিক সংস্কারের মধ্যে গুণাধানের লক্ষণটাই থাকা উচিত ছিল। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি থেকেও এই গুণাধানের কথাটাই মনে বেশী আসে।

তবে এই শাস্ত্রীয় লক্ষণের চেয়েও এখানে যে শিশুর শারীরিক প্রয়োজনীয়তাই বেশি এবং সেই প্রয়োজনীয়তার খাতিরেই যে এই সংস্কার শাস্ত্র এবং সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি আজও এই সংস্কার টিকে আছে দেখে। সুশ্রুতের মতো বিশালবুদ্ধি কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন — শিশুর ছয়মাস বয়সে তার উপযুক্ত এবং সহজপাচ্য অন্যতর খাবার খেতে দেবে — ষণ্মাসং চৈনম্ অন্নং প্রাশ্য়েদ্ লঘু হিতঞ্চ। অন্নপ্রাশন সংস্কারের সৃষ্টি যে-প্রয়োজনে হয়েছে, তা একদিকে স্তন্যদায়িনী জননীরও হিতসাধন করবে, অন্যদিকে শিশুটিরও হিতসাধন করবে। মমতাময়ী জননীরা প্রয়োজনাধিক কাল ধরে শিশুটিকে স্তন্যপান করালে তাঁদের শরীর জীর্ণ হতে থাকে, অতএব সেটা যাতে না হয়; আবার অন্যদিকে অধিক বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান করার ফলে যে শিশুর শক্ত খাবার খেয়ে বড়ো হবার কথা ছিল, সে পেটে ক্ষুধা নিয়ে অন্যভাবে জীর্ণ-শীর্ণ হতে থাকে। অতএব জননী এবং তাঁর জাতক দুজনেরই সুস্থভাবে জীবনশক্তিলাভের প্রয়োজনেই অন্নপ্রাশন সংস্কার মর্যাদা লাভ করেছে।

গৃহ্যসূত্রগুলির মতে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের সাধারণ কাল শিশুর জন্ম থেকে ছয় মাসের মাথায়। মনুর মতও তাই — ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশং মাসি — যাজ্ঞবল্ক্যের মতও তাই। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন এবং এমন লোকাচারও এই রকম আছে যে, — শিশুর দাঁত বেরিয়ে গেলে আর

অন্নপ্রাশন দেবার মানে থাকে না। সবিনয়ে জানাই — শাস্ত্রের মধ্যে অনেক বচনই এখন অনুচিত এবং হাস্যকর মনে হতে পারে এবং হয়তো আঁকড়ে থাকবারও মানে হয় না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সমাজের প্রয়োজনে, ব্যক্তির প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন থেকে বহুতর শাস্ত্রবিধির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এই অন্নপ্রাশনকে কেন্দ্র করেই বলতে পারি যে, শিশুর দাঁত ওঠা বা না ওঠার সঙ্গে অন্নপ্রাশনের কোনো সম্পর্ক নেই। শাস্ত্রকারদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন, যিনি শিশুর দাঁত ওঠার জন্যই অপেক্ষা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন — শাস্ত্রের মত মেনে ছয় মাসের মাথায় অন্নপ্রাশন দিতেই পারো, কিন্তু শিশুর দাঁত উঠলেই ভালো হয় — ষষ্ঠে অন্নপ্রাশনং জাতেষু দন্তেষু বা। বেশ বোঝা যায় — দাঁত উঠলে শক্ত খাবার হজম করার সুবিধে হয় বলেই এই কথা বলেছেন তিনি।

গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতিগুলির বেশির ভাগ ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দেবার পক্ষপাতী হলেও অনেক স্মার্তই বুঝেছেন যে, ব্যক্তি-শিশুর স্বাস্থ্যই এই সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হওয়া উচিত। শিশুর স্বাস্থ্য ঠিক নেই, তরল পদার্থও জীর্ণ হয় না — এই অবস্থায় খুব বিধি মেনে অন্নপ্রাশন দেওয়ার কথা বলেননি শাস্ত্রকাররা। তাঁরা নিয়ম শিথিল করে বলেছেন জন্ম থেকে ধরে ছয়মাসে অন্নপ্রাশন দেওয়া বেশ ভালো। কিন্তু তা না পারলে আট মাসে, নয় মাসে, অথবা দশ মাসেও অন্নপ্রাশন দেওয়া যায় — তদভাবে'ষ্টমে মাসি নবমে দশমে'পি বা। এমনকী স্মার্তপ্রধান অপরার্ক প্রাচীন নিবন্ধকারে শঙ্খের মতো উল্লেখ করে বলেছেন — জন্মের এক বছর পরে বারো মাসের মাথাতেও অন্নপ্রাশন দিতে বাধা নেই — সংবৎসরে'ন্নপ্রাশনম্ অর্ধসংবৎসরে ইত্যেকে।

বারো মাসের পরেও যে অন্নপ্রাশনের বিধান দেননি স্মার্তরা তার সবচেয়ে বড়ো কারণও ওই শিশুর প্রয়োজন। ছ'মাসেই যেখানে একটি শিশু শক্ত খাবার জীর্ণ করার উপযুক্ত সেখানে অন্নপ্রাশন এক বছরের পরে চলে গেলে শিশু এবং জননী দুয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর হবে।

অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান খুব বড়ো নয়। তবে সংস্কারের ছোটো অনুষ্ঠানও বড়ো বলে এখন মনে হয়, তার কারণ যে কোনো এই ধরনের অনুষ্ঠানের আগে নিত্যকর্ম, মাতৃকাপূজা, নান্দীশ্রাদ্ধ ইত্যাদি করতে হয়। তাতে সময় যায় অনেক। অন্নপ্রাশনের মূল অনুষ্ঠানে শিশুর মুখে যে খাবার দেওয়া হত, গৃহ্যসূত্রের ধারা অনুযায়ী তা মোটেই নিরামিষ নয়। শাংখ্যায়ন লিখেছেন — পিতা নিজে সেদিন পাঁঠার মাংস বা পাখির মাংস রাঁধবেন। অবশ্য মাছও রান্না করা যেতে পারে এবং তার সঙ্গে ভাত। সন্তানের পুষ্টি, বুদ্ধি, চেহারার ঔজ্জ্বল্য, অনুভব-শক্তি — এগুলির মধ্যে যদি বিশেষ কোনো গুণের প্রতি পিতামাতার বিশেষ কামনা থাকে, তবে তার জন্য এক-এক রকম পাখির মাংসের ব্যবস্থা করেছেন সূত্রকারেরা। তবে এটাও ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ছয় মাস থেকে এক বছরের শিশুকে ভালো পরিমাণ মাংস খাইয়ে তার পেটের সর্বনাশ করা হত প্রথম দিন থেকেই।

আসলে এগুলি প্রতীক মাত্র। রান্না হত অনেক রকম এবং সব রকম রান্নার কণিকামাত্র গ্রহণ করে তা একত্রে মাখা হত। তার মধ্যে ঘি, মধু, দই। এই সম্মিলিত স্বাদিষ্ঠ বস্তুর আস্বাদ কেমন হত, তা বলতে পারি না এবং শিশুও তা কতখানি উপভোগ করত বা এখনও করে, তা সহজবোধ্য নয়, তবে পরবর্তীকালে জৈন এবং বৈষ্ণবদের প্রভাবে শিশুকে মাংস খাওয়ানোর বায়নাটা উঠে যায়। থেকে যায় স্বর্ণরেণু-ঘষা সহ ঘি-মধু, দই — যা বৈদিক খাদ্যতালিকার নিরামিষ অবশেষ। একেবারে শেষ যুগে আসে পরমান্ন — মধ্বাজ্যং কনকোপেতং প্রাশয়েৎ পায়সং তু তম্ — এই পরমান্নের মধ্যেও মধু, ঘি এবং সোনার রেণু ঘষে দেবার রীতি ছিল — এবং স্বভাবতই স্তন্যপানসিক্ত শিশুর মুখে পরমান্নের স্বাদ অবশ্যই মধুর এবং চমৎকার। সোনার ব্যাপারটা হয়তো কবিরাজ মশাইদের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু যা কিছুই পর পর এসেছে তা বৈদিক সমাজ থেকে আধুনিক সমাজের খাদ্যতালিকার বিবর্তন অনুযায়ী এবং অবশ্যই শিশুর ঔদরিক ক্ষমতার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা অনুযায়ী।

অন্নপ্রাশনের মন্ত্র বলার সময় ভগবতী বাগ্‌দেবীর কাছে স্তুতি করা হয়েছে, যাতে তিনি দুগ্ধদায়িনী ধেনুর সঙ্গে একাত্মিকা হয়ে নবজাতকের সঙ্গে সকলেরই শক্তি এবং সামর্থ্য বিধান করেন — ধেনুর্বাগস্মান্ উপ সুষ্টুতৈতু। পরবর্তী কালে রসশাস্ত্রের মধ্যে 'বাক্' অর্থাৎ শব্দার্থভাবনাকে অনেক সময়ে ধেনু বা গোরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে — বাগ্‌ধেনোর্দুগ্ধ এতং হি। কিন্তু অন্নপ্রাশনের সময়ে এই মন্ত্রোচ্চারণে বোঝা যায় প্রাচীনেরা খাবার দিয়ে শরীর মোটা করার চেয়ে যাতে তা বালকের বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জীবিত হয় সেটাই চাইতেন। আরও যে মন্ত্রটা আছে, সেটা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নুট্ হ্যাম্প্‌সুনের 'হাঙ্গার' বইটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃষ্টরূপে ভোজন যে শুধুমাত্র পেটের মাধ্যমেই হয় না, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই যে আহার আছে এবং অন্নপ্রাশনের সময় একটি শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিবৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও যে তর্পণ করতে হয়, তাই যেন বলা হয়েছে মন্ত্রের মধ্যে — প্রাণবায়ুর দ্বারা আমি অন্ন গ্রহণ করি। অপানবায়ুর দ্বারা আমি গন্ধ গ্রহণ করি। চক্ষুর দ্বারা আমি রূপ গ্রহণ করি। কর্ণের দ্বারা আমি বিদ্যা এবং যশ লাভ করি। অর্থাৎ অন্নপ্রাশন মানে শুধু ভাত খাওয়া নয়, একটি শিশুর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উপভোগযোগ্য করে তোলাই অন্নপ্রাশন — অনেন আহুতি-চতুষ্টয়েন চক্ষুরাদীন্দ্রিয়োপভোগ্যান্ বিষয়ান্ অনুভবামি ইতি আশংসা। এখানে যিনি মন্ত্র বলছেন, তিনি 'আমি করি' বললেও এটা শিশুই যেন বলছে বলে বুঝতে হবে।

৮। চূড়াকরণ:

চূড়া মানে এখানে চুল। করণ মানে করা। অর্থাৎ মাথার ওপরে চূড়ার মতো উঁচু করে চুল রাখা। সোজা কথায় টিকি রাখা। আশ্চর্য হল — চূড়াকরণের মধ্যে টিকি রাখার মতো একটা অস্তিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এর নেতিবাচক দিকটা অর্থাৎ মাথা ন্যাড়া করা বা চুল ফেলে দেবার দিকটাই কিন্তু জনমনে বেশি প্রকট এবং তাও আজ থেকে নয়, বহু প্রাচীন

কাল থেকেই। যদিও এই সংস্কারের নাম দেবার সময় কখনো নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কখনো এর নাম চূড়াকরণ, কখনো চূড়াকর্ম আবার কখনো বিবর্তিত ভাষায় চৌলকর্ম। অর্থাৎ নামের মধ্যে অধিকাংশ চুল ফেলে দিয়ে চূড়ার মতো চুল রাখার অর্থটাই বেশি প্রকট।

সংস্কার শব্দের পারিভাষিকতার দিক থেকে এর মধ্যেও গর্ভদোষ নষ্ট করার হেতু আছে বলে স্মার্তরা অনেকে মনে করলেও অনেকেই বলেছেন — চূড়াকরণের মাধ্যমে পাপ নষ্ট হয় এবং দীর্ঘায়ু তথা যশ-লাভ ঘটে — তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোকায় স্বস্তয়ে। অর্থাৎ সাংস্কারিক অর্থে চূড়াকর্মের মধ্যে দোষাপনয়ন এবং গুণাধান দুইই আছে। সংস্কার, ধর্ম, আচার — সবকিছু বাদ দিয়ে যদি লৌকিক দৃষ্টিতে দেখি, তবে বলতে হবে — এই সংস্কারের জন্ম হয়েছিল নিছক প্রয়োজনীয়তা থেকে এবং সে প্রয়োজনীয়তাও অনেকটাই শারীরিক।

ভেবে দেখুন, অতি প্রাচীনকালে এখনকার দিনের মতো ভালো চিরুনি পাওয়া যেত না। যদি বা শজারুর কাঁটা বা অন্য কিছু দিয়ে চুল আঁচড়ানো বা পাট করার পদ্ধতি কিছু থেকেও থাকে, তবু তা দুই-তিন বছরের শিশুর মাথার পক্ষে খুব বোধহয় উপযোগী ছিল না। ফলত শিশুর মাথায় যেসব ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হত, তা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় ছিল মাথা ন্যাড়া করে ফেলা। আবার ন্যাড়া করার বিপদও কিছু কম নয়। মাথায় যে ক্ষুর দিয়ে চুল চেঁছে ফেলতে হবে সে ক্ষুরের ধারও কম নয়। ক্রন্দনরত শিশুর মাথায় ক্ষুর দিয়ে চুল ফেলে দিতে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে বাপ-মায়ের মনে ভয়ও কিছু কম হত না। ফলে শিশুর পিতা চূড়াকরণের সময় মন্ত্র প'ড়ে শুধু ক্ষুরের স্তুতি করেন, যাতে ক্ষৌরকর্মে শিশুর অন্য বিপদ না আসে।

মাথা ন্যাড়া করার স্বাস্থ্যসম্মত কারণ বা প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে নেই এমনকী মন্ত্রগত ক্ষুরস্তুতির কারণও আমরা লৌকিকভাবে বুঝতে পারি, কিন্তু মাথার পেছনে একগুচ্ছ চুল রেখে দিয়ে চূড়া সৃষ্টি করার লৌকিক তাৎপর্যটা কী? এর উত্তর দিয়েছেন সেকালের

ডাক্তার-বদ্যিদের প্রধান চরক-সুশ্রুত। সাধারণভাবে বলবার সময় সুশ্রুত লিখেছেন — মাথা ন্যাড়া করলে এবং নখ কাটলে শরীরের শুদ্ধতা এবং লঘুতা যেমন আসে, তেমনই আসে হর্ষ, সৌভাগ্য এবং উৎসাহ — হর্ষ-লাঘব-সৌভাগ্যকরম্ উৎসাহবর্ধনম্। চরকও ওই একই কথা বলেছেন, তবে তিনি একটু বেশি বয়সেই চুলদাড়ি-নখ কাটার কথা-প্রসঙ্গে উপরি উক্ত হর্ষ- সৌন্দর্যের উল্লেখ করেছেন।

আমাদের বক্তব্য — বেশ তো, ন্যাড়া হলাম, কিন্তু মাথার পিছনে ওই এক ঝুঁটি চুল রেখে ন্যাড়া হবার প্রয়োজন কী! পরিষ্কার হব তো পুরো মাথা কামিয়েই পরিষ্কার হই। শুশ্রুত তাঁর নিজস্ব অ্যানাটমির জ্ঞান থেকে বিধান দিয়ে বলেছেন — মাথার পেছনে ওপরের দিকে, যেখানটা বাইরে থেকে চুলের একটা ঘূর্ণিমতো দেখা যায় সেখানে মাথার ভিতরে কতগুলি শিরার সন্ধিস্থান। এর নাম অধিপতি। এইখানে কোনো আঘাত লাগলে নিশ্চিত মরণ — শিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্তো'ধিপতি স্তত্রাপি সদ্যো মরণম্। অতএব মাথার ওই অংশে যদি ভালো করে একটা ঝুঁটি বেধে টিকি রাখা যায়, তাহলে যথাসম্ভব সুরক্ষিত থাকে মাথার ওই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল জায়গাটা। চূড়াকরণের বৈদ্যক প্রয়োজনীয়তা ওইখানেই।

সাংস্কারিক নিয়মমতো চূড়াকরণের বয়স শিশুর এক বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে। মনুর মত অন্তত তাই। কিন্তু আশ্বলায়ন লিখেছেন — জন্ম থেকে তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বৎসর এমনকী উপনয়নের সময়েও এই মৌলকর্ম করা যায়, আজকাল অবশ্য শেষেরটাই চলে। তবে সেযুগে যেহেতু আট বছরেই উপনয়নের সময় হয়ে যেত, তাই মাথা-ন্যাড়া করার সাংস্কারিক কর্মটি যে খুব দেরিতে হত, তা বলা যায় না।

চূড়াকরণের মন্ত্র-তাৎপর্য আগেই বলেছি — ধারালো ক্ষুরের কাছে স্তুতি, নাপিতের কাছে স্তুতি — যাতে বালকের কোনো ক্ষতি না হয়। আর যেটা না বললেই নয়, সেটা হল টিকি রাখার পদ্ধতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা পারিবারিক নিয়মেই চলত, তবে কোথাও কোথাও গোত্র-

প্রবরের সংখ্যা মেনে ততগুলি শিখা রাখা হত। বশিষ্ঠ ঋষির বংশধারায় মাথার মাঝখানে মোটা টিকি, অত্রি এবং কাশ্যপগোত্রীয়দের মাথার পিছনে দুই দিকে দুটি শিখা। আঙ্গিরস গোত্রীয়দের পাঁচটি শিখা, এতে মাথার পিছনটা ভরেই থাকত চুলে। আর ভার্গবরা টিকি রাখতেন না, তাঁরা একেবার মুণ্ডিত-মস্তক। উত্তরভারতীয়রা বাঙালি-ব্রহ্মণের টিকির চুলে কমতি দেখে বাঙালিদের বিদ্রূপ করে বলেন — বাঙ্গাল্‌কে বাম্‌ভন সব ভার্গব্‌ হ্যায়।

৯। কর্ণবেধ :

এও একটা সংস্কার। সোজ অর্থ কানের লতিতে ফুটো করা। খেয়াল করে দেখবেন — এখন মাথা ন্যাড়া করা, কান ফুটো করা — সবই হয় পৈতের সময়। কিন্তু পূর্বকালে এগুলি সবই করতে হত পৈতের আগে। গৃহ্যসূত্রগুলি প্রায়ই এই কর্ণবেধের কথা উল্লেখ করেননি, তার কারণটাও পরিষ্কার। আসলে কান ফুটো করার মূল উদ্দেশ্য ছিল শরীরের অলংকরণ। ন্যাড়া মাথায় কানে দুল পরে কী যে শোভা হত, তা জানি না। তবে পরবর্তী স্মৃতিগুলিতে কর্ণবেধ ভালোভাবে স্থান করে নিয়েছে বলেই বলতে পারি, প্রাচীনেরা একেবারে রুক্ষ-শুষ্ক ছিলেন না। কানে দুল পরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তাঁদের কিছু আকর্ষণ ছিলই, নইলে, এটা সংস্কারে পরিণত হয় কী করে! তবে সেকালের প্রধান বদ্যি সুশ্রুত কিন্তু খুব বাচ্চা অবস্থাতেই কান ফুটো করে দেবার পক্ষপাতী। তাঁর মতে এতে অলংকরণের সুবিধে রইলই, উপরন্তু তাঁর মতে অল্প বয়সে কানের লতির ওপরে শাঁখের মতো জায়গাটায় ফুটো করে দিলে নাকি 'হাইড্রোসিল' বা 'হার্নিয়া'র মতো অন্ত্রবৃদ্ধির অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে — শঙ্খোপরি চ কর্ণান্তে... বিধ্যেদ্‌ অন্ত্রবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে।

১০। উপনয়ন:

বহুশ্রুত শব্দ, বহু তর্কিতও বটে। উপনয়ন এখন যেমন এক ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে, সেকালে তেমন ছিল না। উপনয়ন ছিল প্রধানত ছাত্রাবস্থার দ্যোতক, যাকে অন্য পরিভাষায় বলা যায় ব্রহ্মচর্য। পরবর্তীকালে উপনয়নের পূর্বে আরও একটি সংস্কারের সৃষ্টি হয়, যার নাম বিদ্যারম্ভ। ইস্কুলে যাবার আগে যেমন হাতেখড়ি, এও তেমনই। পাঁচ বছর বয়সেই বিদ্যারম্ভের সূচনা হত। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন — পরবর্তীকালে ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শিক্ষণীয় বিদ্যা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এসে যাওয়ায় বেদ-বিদ্যা লাভের সময় পিছোতে থাকে। ফলে বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান করে প্রাথমিক পড়াশুনো আরম্ভ হয়ে যেত। পরে আট বছর বয়সে অথবা আরো কিছু পরে গুরুকুলে গিয়ে বেদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা আহরণের সূচক হিসেবে উপনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হত।

উপনয়ন শব্দটি আসছে নী ধাতু থেকে, যার অর্থ নিয়ে যাওয়া, 'উপ' মানে কাছে। উপনয়ন মানে কাছে নিয়ে যাওয়া। কার কাছে নিয়ে যাওয়া? বৈদিক, ঔপনিষদিক, স্মার্ত — যাঁর কাছেই জিজ্ঞাসা করুন, একই উত্তর হবে — আচার্যের কাছে শিক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার নামই উপনয়ন। আজকাল যেমন 'পৈতে' বললেই মাথা ন্যাড়া করা, কান ফোটানো এবং গলায় একটি নবতন্ত্রী সূত্রধারণের কথা মনে আসে, খোদ বৈদিক যুগে এ রকম ছিল না বলেই মনে হয়। প্রথম কথা হল মাথা ন্যাড়া করা বা কানবেঁধানোর সঙ্গে পৈতের কোনো সম্বন্ধই নেই, কারণ এসব অনুষ্ঠান আগেই হয়ে যেত অন্নপ্রাশনের দুই-তিন বছরের মধ্যেই। পৈতের পরে বরং চুল-দাড়ি রাখারই নিয়ম। আর গলায় যে যজ্ঞসূত্রের অধিষ্ঠান দেখি আজকাল, তাও ব্রাহ্মণ্যাচারের মধ্যে এসেছে অনেক পরে। অনেক পরে।

বস্তুত 'উপনয়ন' শব্দটার পূর্বরূপ হল ব্রহ্মচর্য, যা নাকি একটি বালকের ছাত্রাবস্থা সূচনা করে। ঋগ্‌বেদের মধ্যে আমরা 'ব্রহ্মচারী' শব্দটি

পাচ্ছি — ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্ — কিন্তু উপনয়ন শব্দটি ঋগ্‌বেদে মোটেই পরিষ্কার নয়। একটি ঋকের মধ্যে অবশ্য পণ্ডিতেরা উপনয়ন শব্দটির গন্ধ পেয়েছেন, কারণ মন্ত্রটি উপনয়নের সময় বলতে হয় এখনও। এই মন্ত্রর মধ্যে সুবাস, সুবেশ এক যুবক যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে এবং বলা হচ্ছে — এই যুবককে দেবভাবপ্রাপ্ত আচার্য ঋষিরা উন্নীত করেন — তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। এখানে 'উন্নয়ন্তি' — এই ক্রিয়াটির ধাতুগত অর্থ উপনয়ন শব্দের প্রতিশব্দ বলে মনে করেন বৈদিকেরা।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উপনয়ন সংস্কারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত না হলেও অথর্ববেদে এসেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে উপনয়নের যে রূপ আমরা পাই, তার অনেকটাই পাওয়া যায় অথর্ববেদে, আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনার সময় ব্রহ্মচারী হবার জন্য ছাত্ররা যেভাবে গুরুর কাছে এসেছে, তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। উপনিষদগুলির মধ্যে ব্রহ্মচর্য এবং উপনয়নের সময়কালীন গায়ত্রীমন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্যে চিহ্নিত, আর গৃহ্যসূত্রগুলি রচনার সময় উপনয়ন একেবারে আচার-ব্যবহারে ঠাসা হয়ে সর্বৈব এক ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হল।

বস্তুত উপনয়ন এবং ব্রহ্মচর্য বালকের ছাত্রাবস্থা অথবা আরও বিশদার্থে যৌবনসন্ধির সূচনা করত সুপ্রাচীন কালে। এখনকার দিনে প্রথম স্কুলে যাবার জন্য বাবা-মা যেমন তাঁদের বালকটিকে সুবেশে সুসজ্জিত করে নিয়ে যান এবং ইস্কুলের শ্রেণিপ্রধান তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সভ্যতার প্রথম উন্মেষেও যে সেইরকমই ছিল তারই পরিচয় মেলে ওই পূর্বকথিত ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে — সুন্দর বসন পরিধানে যুবকটি আসছে, তাকে ঘিরে আছে মেখলা। সে যখন দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করবে, তখনই তার মাহাত্ম্যের সূচনা হবে — যুবা সুবাসঃ পরিবীত অগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।

উপনয়ন-সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ যে দ্বিতীয় বার জন্ম লাভ করে — সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে — যে জন্য তাকে দ্বিজ বলা হয়, সেই দ্বিজত্বের তাৎপর্যও হয়তো প্রথম ওই ঋক্‌মন্ত্র থেকেই উৎসারিত — স উ শ্রেয়ান্

ভবতি জায়মানঃ — কিন্তু দ্বিতীয় জন্ম বা নবজন্মের তাৎপর্যটা যে বহুকাল থেকে চলে আসছে তা বোঝা যাবে পার্শিদের 'নৌ জত্' (নবজন্ম) অনুষ্ঠান থেকে। পার্শিদের 'নৌ জত্' পরবের সময় হল বালক-বালিকার ছয় বৎসর বয়সে। বিদ্যারম্ভের সময়টুকু উপনয়নের মধ্যে ধরে নিলে আমাদের এই সংস্কারটিও নৌ জত্-এর সঙ্গে মিলে যাবে। ভাষাতত্ত্বের নিরিখে অতএব জোর দিয়েই বলা যায় আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠী যখন ইরানি গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মক ছিল, তখন থেকেই এই সংস্কারের সূচনা হয়েছে।

ব্রহ্মচর্য এবং উপনয়নের অনুষ্ঠানের মধ্যে যে দ্বিতীয় জন্মের তাৎপর্য আছে, তার সূত্রটা অথর্ববেদের মধ্যেও খানিকটা রূপকের মাধ্যমে ধরা আছে। ব্রহ্মচারী আচার্যের কাছে বিদ্যা শিখতে আসত, এবং আচার্য তার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো তিন রাত্রি রক্ষা করতেন — আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ। মন্ত্ররূপক বলেছে — সেই ব্রহ্মচারী যখন আচার্যের গর্ভাবিহিত অবস্থা থেকে জন্মলাভ করে, তখন দেবতারা তার চারপাশে থাকেন। হয়তো এই মন্ত্রের মধ্যে তিন রাত্রির কথাটা থাকায় — তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি — এখনো পৈতের পর অন্তত তিনরাত্রি অসূর্যস্পর্শ্য হয়ে ঘরে থাকবার বিধান। অথর্ববেদে যা রূপক আকারে বিবৃত, শতপথ ব্রাহ্মণে তা আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে — উপনয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে আচার্য তাঁর শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করেন এক সময়। এটা ব্রহ্মচারীকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করার প্রতীক। শতপথ বলেছে — ব্রহ্মচারীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে আচার্য তাকে আপন অন্তরে গর্ভের মতো ধারণ করেন — আচার্যো গর্ভীভবতি হস্তমাধায় দক্ষিণম্। এর তিন দিন পর গায়ত্রীর সঙ্গে জন্মলাভ করে শিষ্য ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন। দেখুন, এখানেও সেই তিন দিনের কথা, এখন যেটা ত্রিরাত্রিক গৃহগর্ভবাসে পরিণত হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে একটি বালকের উপনয়ন-প্রক্রিয়া যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে — বিদ্যালাভার্থী বালক প্রথমে এসে আচার্যের কাছে এসে বলত — আমি ব্রহ্মচর্যের জন্য এসেছি, আমি ব্রহ্মচারী হতে

চাই। গুরু বলতেন — তোমার নাম কী বৎস? বালক নাম বললে পরে গুরু যদি তাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করতে চাইতেন, তবে তার কাছে এসে (এই কাছে আসাই — উপনয়তি, উপনয়ন) তার দক্ষিণ হাতখানি নিজের হাতে ধরতেন — অথাস্য হস্তং গৃহ্ণাতি। তারপর বালকের নাম ধরে বলতেন — তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ইন্দ্র তোমার আচার্য; তোমার আচার্য হলেন অগ্নি এবং আমিও তোমার আচার্য। এরপর আচার্য তাঁর নবাগত শিষ্যকে ক্ষিতি-অপ-তেজ ইত্যাদি পঞ্চভূত এবং ওষধি বনস্পতির তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতেন মন্ত্র পড়ে। আসলে গুরুগৃহে থাকতে হলে ছাত্রকে নিজের মাকে ছেড়ে এসে প্রকৃতিমায়ের কোলে আশ্রয় নিতে হত বলেই হয়তো এই নিয়ম।

অঙ্গীকরণ বালককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাচিক অঙ্গীকারটুকুই সব নয়, আচার্য তাঁর নবাগত শিষ্যকে এক মুহূর্তের মধ্যে আপন গৃহের একজন করে তুলতেন তাঁর নিজের কর্মভার শিষ্যের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে। আচার্য বলতেন — এই জল পান করো, বৎস — অপো'শান। আমার ঘরের কাজ করো। এই যে গার্হ্যপত্য অগ্নি জ্বলছে দিনরাত, একে নিভতে দেওয়া চলবে না, এতে সমিধ-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করবে সময়ে সময়ান্তরে। আরও একটা কথা, দিনে ঘুমোনো চলবে না — মা সুষুপ্‌থা ইতি। আচার্য এরপর শিষ্যের কানে গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করতেন।

কবে লেখা হয়েছে এই শতপথ ব্রাহ্মণ? খুব কম করে হলেও খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম- নবম শতাব্দী হবে। তো শতপথ তারও আগেরকালের রীতি উল্লেখ করে বলেছে — প্রাচীন কালে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে এলে তার আগমনের দিন থেকে এক বছর পরে গায়ত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দিতেন আচার্য। তারপরে এটা ছয় মাসের মাথায় এসে দাঁড়ায়। তারপর চব্বিশ দিনের মাথায়, আরও পরে বারো দিনের মাথায়, শেষে তিনদিন পরে। অর্থাৎ সেই যে আচার্য শিষ্যের হাতখানি ধরে তাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করতেন, তারপর তিনদিন পর সাবিত্রী-মন্ত্র তার কানে উচ্চারণ করলে সে ব্রাহ্মণ হয়ে নবজন্ম লাভ করত — তৃতীয়স্যাং স জায়তে সাবিত্র্যা সহ ব্রাহ্মণঃ।

এই যে এক বছর থেকে ক্রমে ক্রমে গায়ত্রী-দীক্ষার সময় তিনদিনের মাথায় নেমে এল — এতে বেশ বোঝা যায় যে, গুরুগৃহের ছাত্রজীবনের চেয়েও গায়ত্রী-মন্ত্রের ধর্মীয় মাহাত্ম্য অধিক গুরুতর হয়ে উঠেছিল। শতপথ, তৈত্তিরীয়, গোপথ ইত্যাদি প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি তথা ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকের মতো প্রাচীন উপনিষদগুলির প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বোঝা যায় — তখনকার দিনে উপনয়ন বা ব্রহ্মচর্য এক বিশাল আচারক্লিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাকামী শিষ্য হাতে একখণ্ড সমিধ-কাঠ নিয়ে গুরুগৃহে উপস্থিত হলেই আচার্য বুঝতে পারতেন — বালকটি গুরুগৃহে থেকে বিদ্যালাভ করতে চায়। গুরু তাঁকে তখন অঙ্গীকার করে নিতেন পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায়।

উপনয়ন-সংস্কারের আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব, যা পরবর্তী কালে গৃহসূত্রগুলির সময় থেকে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, সে গুরুত্ব যে বেশি ছিল না তা উপনিষদের দু-একটি উদাহরণ থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। উপনিষদের কালেও এমন মনভোলা, শুধুই বিদ্যাব্যসনী আচার্য ছিলেন অশ্বপতি কেকয়। তাঁর কাছে ঔপমন্যব প্রাচীনশাল, তাঁর আরও চারজন বিদ্যার্থী বন্ধুর সঙ্গে সকালবেলাতেই উপস্থিত হয়েছিলেন সমিধ-কাঠ হাতে নিয়েই — তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে — যাতে গুরু অশ্বপতি বুঝতে পারেন যে, তাঁরা উপনয়নের পর গুরুগৃহে থেকেই বিদ্যালাভ করতে চান। মনভোলা আচার্য অশ্বপতি বিদ্যা বোঝেন, অনুষ্ঠান বোঝেন না। তিনি সমিধকাঠের প্রতীকটুকু দেখলেন। দেখেই বিদ্যাবচন আরম্ভ করে দিলেন আপন মনে। উপনয়নের ধারও ধারলেন না — তান্ হ অনুপনীয় এব এতদ্ উবাচ।

আবার অতি সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই যে উপনয়ন হয়ে যেত তারও উদাহরণ রয়েছে সেই বিখ্যাত সত্যকামের উদাহরণে, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন — অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী-তীরে। জাবাল সত্যকাম যখন হারিদ্রুমত গৌতমের কাছে এসে জননী জবালার কাহিনি শোনাল, গৌতম সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলেছেন — তুমি সত্যবাক্য থেকে

চ্যুত হওনি। অতএব আর দেরি নয়। তুমি সমিধ-কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনো, তোমাকে এখনই উপনয়ন দেব — সমিধং সৌম্য আহর উপ ত্বা নেষ্যে, ন সত্যাদগা ইতি। অর্থাৎ উপনয়ন তখন এতটাই সহজ ছিল। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচর্যের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের বিদ্যা-সংবাদ গুরুত্বহীন হয়ে উঠতে আরম্ভ করল, বড়ো হয়ে উঠল ব্রাহ্মণ হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার তাগিদ এবং এই প্রতিষ্ঠারই প্রতিভূ হয়ে উঠল উপনয়ন।

আগে ছাত্রাবস্থা এবং বিদ্যালাভের দিকে নজর রেখে শিষ্যের প্রতি কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করতেন আচার্য। বিধির মধ্যে প্রধান ছিল গার্হপত্য অগ্নি জিইয়ে রাখার জন্য সমিধ কুড়িয়ে আনা এবং সেই অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা। প্রতিদিনের এই শৃঙ্খলা পালনের সঙ্গে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম পরিধান করা বা দাড়ি রাখার মতো নিয়ম পালন করতে হত, যাতে ছাত্রজীবনে বিলাসিতার কোনো প্রশ্রয় না থাকে। অন্যদিকে যে-সব আহারে শারীরিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সে-সব ছিল একেবারে বারণ। শতপথ বলেছে — ব্রহ্মচারী হয়ে যেন মধুপান কোরো না কখনও — ন ব্রহ্মচারী সন্ মধু অশ্নীয়াৎ। এ ছাড়া ভালো বিছানায় উচ্চাসনে শোয়া, নাচা-কোঁদা, গান গাওয়া, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো বা এটা-ওটা খেয়ে খালি খালি থু-থু ফেলাও চলবে না পড়াশোনার কালে — নোপরিশায়ী স্যান্ন গায়নো ন নর্তনো ন সরণো ন নিষ্ঠীবেদ্। আবার ভালো লাগল না, তো শ্মশানে গিয়ে উদাসীন হয়ে বসে রইলাম — তাও চলবে না — ন শ্মশানমাতিষ্ঠেৎ। পরিশ্রমের মধ্যে আছে দৈনন্দিন ভিক্ষা করা অর্থাৎ নিজের খাবার নিজে জোগাড় করার অভ্যাস তৈরি করা। অবশ্য ভিক্ষার কোনো অভাব হত না, কারণ অন্য গৃহের স্নেহশালিনী জননীরা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষার দেবার জন্য উন্মুখ স্নেহে অপেক্ষা করতেন। সবমিলিয়ে বুঝি — কৃচ্ছ্রতা, শৃঙ্খলা এবং পরিশ্রম এই তিনটিই বিদ্যার্জনের অনুষঙ্গ ছিল প্রাচীন কালে।

গৃহ্যসূত্রগুলি এবং স্মার্তদের হাতে পড়ে উপনয়ন যখন ধর্মের মাহাত্ম্যে সজ্জিত হল, তখন উপনয়নের শুভ দিন-ক্ষণ বিচার থেকে আরম্ভ করে গায়ত্রী-জপ, হোমকর্ম, বিশেষ বিশেষ ব্রতপালন — এইগুলিই

ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্ম হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণের উপনয়নের বয়সকাল স্মার্তমতে জন্ম থেকে অষ্টমবর্ষ। ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন এগারো বছরে, বৈশ্যের বারোতে। এই নিয়মে যথাক্রমে ষোলো, বাইশ, এবং চব্বিশের পর আর উপনয়ন চলত না। ব্রাহ্মণের পক্ষে বয়সটা যে কম ধরা হয়েছে, তার কারণ অনেক সময়েই এরা পিতার কাছেই বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে যেহেতু গুরুগৃহেই যেতে হত, তাই বাপ-মায়ের সান্নিধ্য আরও কিছুদিন অনুমত হয়েছে শাস্ত্রকারদের বিধিতে।

উপনয়নের মন্ত্র এবং অন্যান্য বিধি সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু এখানে তার পরিসর নেই। তবে যে-কথা না বললে নয়, সেটা হল — পৈতে বা উপবীত বলতে আজকাল যে বামুনের গলায় সূত্রগুচ্ছ দেখি, প্রাচীনকালে পৈতের এই চেহারা ছিল না। গুরুগৃহে আসলে ব্রহ্মচারীর পরিধান ছিল দুটি — অধমাঙ্গের বসন এক খণ্ড আর এক খণ্ড উত্তমাঙ্গের বসন যার নাম উত্তরীয়। এই উত্তরীয়-বসনখানিই — তা যে সব সময়েই সুতোর কাপড় হত, এমন কথা নেই, কখনো তা কৃষ্ণসার মৃগচর্ম যার নাম ছিল অজিন — সেটাই যজ্ঞোবপীত বা পৈতের কাজ করত — অজিনং বাসো বা দক্ষিণতো উপবীয় দক্ষিণং বাহুমুদ্ধরতে অবধত্তে সব্যমিতি যজ্ঞোপবীতমেতদ্। পরবর্তীকালে বিকল্প হিসেবে সূত্রগুচ্ছের ব্যবহার সিদ্ধ হয় এবং সেটাই এখন প্রতীকীভাবে প্রধান হয়ে উঠছে পৈতে নামে।

গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতির মধ্যে পৈতের মন্ত্র হিসাবে যা আছে এবং এখনও যা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে দুটি মন্ত্র এখানে লক্ষণীয়। এক হল — মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু ইত্যাদি। সিনেমা, টিভি এবং সাহিত্যের বহুত্র বিয়ের কথা হলেই এই মন্ত্রটির সন্ধান পড়ে। মনে রাখতে হবে — এটা প্রাথমিকভাবে একটি উপনয়নের মন্ত্র। এই মন্ত্রবলে গুরু শিষ্যকে আপন ব্রত, কর্ম, এবং ভাবনার সঙ্গে একাত্ম এবং একমুখীন করে তোলেন। আর এই মন্ত্রই যখন বিবাহের সময়ে পঠিত হয়, তখন স্বামী তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে একাত্মক করে তোলেন নিজের সঙ্গে। অন্য মন্ত্রটি

অশ্মারোহণের মন্ত্র এবং এটিও উপনয়ন এবং বিবাহে একত্তর হয়ে গেছে। উপনয়নের সময় এই মন্ত্র পড়ে গুরু শিষ্যকে একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে বলেন — এই পাথরের মতো স্থির হও ইত্যাদি। গুরুগৃহের বাসকালে শিষ্য যাতে ব্রতে, নিয়মে, কৃচ্ছ্রতায় এবং অবশ্যই গুরুর স্নেহভাবনায় স্থিরবুদ্ধি হয়ে থাকে সেই জন্যই এই মন্ত্র পড়া। আর বিবাহের সময় পরগৃহাগতা কন্যা যাতে শ্বশুরবাড়িতে মনস্থির করে স্বামীর অনুগামিনী হয়, সেই জন্যই স্বামী মন্ত্র পড়েন — এই প্রস্তরখণ্ডের মতো স্থির হও — অশ্মেব ত্বাং স্থিরা ভব। হয়তো উপনয়ন সংস্কারে গুরু এবং শিষ্যের একাত্মতা এবং পারবশ্যের মতো বিবাহেও স্বামী-স্ত্রীর একাত্মতা এবং পারবশ্য একরকম বলেই বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন।

উপনয়নের পর শিষ্যের পাঠকাল নির্ধারিত ছিল মোটামুটি তার চব্বিশ বছর পর্যন্ত। গুরুগৃহে বাসের কাল খুব কম করে ছিল বারো বছর। তাতে একজন ব্রহ্মচারী তার আঠারো কিংবা কুড়ি বছর কাল পার করলেই বিদ্যামুক্তির স্নান করে স্নাতক বলে চিহ্নিত হতেন। স্নানের পর হত সমাবর্তন। শব্দ দুটি এখনও প্রচলিত। সমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর অনুমতি নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন বিদ্যালব্ধ ব্যক্তি। সকলেই যে ফিরে আসতেন তা নয়। অনেকেই, যাদের ইচ্ছা এবং একাগ্রতা বেশি ছিল, তাঁরা গুরুগৃহে থাকতেন আরো বেশি কাল, যতদিন না সম্পূর্ণ বিদ্যা তাঁদের অধিগত হত।

১১। বিবাহ:

স্নাতক সমাবর্তনের পরেই বিবাহের অধিকার পেত সেকালে, যদিও সমাবর্তন কখনো বিবাহের 'পাসপোর্ট' হিসেবে গণ্য হত না, যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন — বিবাহ শুধুমাত্র সংস্কার নয়, চতুরাশ্রমের মধ্যে এটি একটি আশ্রম, ব্রহ্মচর্যের পরেই যার স্থান। সংস্কার শব্দটির পারিভাষিক অর্থ প্রয়োগ করলে বিবাহের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষের যোগ্যতা তৈরির

তাৎপর্যটাই বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিবাহ্ গুণাধান করে। বিবাহ্ একটি মানুষকে শুধু সন্তানসৃষ্টির মাধ্যমে আপন ব্যক্তি-সত্তার উত্তরাধিকার তৈরি করতেই সাহায্য করে না, বিবাহ তাকে ধর্মপালন করতে সাহায্য করে।

শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে — একজন ব্যক্তি-পুরুষ মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে অর্ধাংশমাত্র। যতক্ষণ না পুরুষ এক রমণীকে জায়া হিসাবে লাভ করছে, যতক্ষণ না সে সন্তান লাভ করছে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ হয় না — অর্ধং হ্ বা এষ আত্মনো যজ্জায়া। তস্মাদ্ যাবজ্-জায়াং ন বিন্দতে নৈব তাবৎ প্রজায়তে অসর্বো হি তাবদ্ ভবতি। তাহলে সম্পূর্ণ হবার জন্যই একটি পুরুষের বিবাহ প্রয়োজন — জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, জাগতিক, ধর্মীয় এবং মানসিক — সর্বত্র নিজেকে যোগ্য করে তোলার মধ্যেই বিবাহের সার্থকতা, যার জন্য বিবাহকে বা গার্হস্থ্য আশ্রমকে বলা হয়েছে 'সর্বোপকারক্ষম'। এখনকার দিনে কথাটা মূল্যহীন শোনাবে, কিন্তু সেকালের দিনের গার্হস্থ্য আশ্রমে যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করাটা স্ত্রী ছাড়া সম্ভব হত না এবং এই যজ্ঞ-সম্পাদনের ধর্মটাকে এতই মূল্য দিতেন প্রাচীনেরা যে, এই একত্র ধর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যটাই বিবাহ-সংস্কারের অন্যতম তাৎপর্য হিসেবে বড়ো হয়ে উঠেছিল — সহত্বং কর্মসু, সহধর্মচারিত্বম্।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে, বিবাহের পর যে স্ত্রী ধর্মপালনে সাহায্য করে এবং যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তাকে ছেড়ে দিয়ে পুরুষ মানুষ যেন দ্বিতীয়বার বিবাহ চিন্তা না করে — ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত। আধুনিকেরা ভাবতে পারেন — যত ধোকাবাজি! বিবাহ করে ধর্ম হচ্ছে? সন্তানোৎপত্তিটির কথাটাও যেন কেমন ধর্মের আবরণে ঢাকা। সত্যি বলতে কি, একসঙ্গে যজ্ঞকর্ম করার কোনো সরসতা আজকের দিনে নাই থাকতে পারে, কিন্তু এই ধর্ম-করার মধ্যে দিয়ে প্রাচীনেরা যেটা বোঝাতে চেয়েছেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। ওঁরা বলেছেন — যেদিন থেকে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করলে সেদিন থেকে একটি পুরুষের জীবনে সমস্ত কর্মের মধ্যেই স্ত্রীর সহ-ভাব এসে গেল, শুধু যজ্ঞ-কর্ম নয়, সমস্ত কর্মে —

পাণিগ্রহণাদ্ধি সহত্বং কর্মসু।

এখনকার দিনের প্রগতিবাদিনীরা — যারা প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকের অধিকার নিয়ে সমধিক চিন্তিত, তাঁরা প্রাচীন শাস্ত্রের একাংশ মাত্র পড়েন এবং অন্যাংশ পড়েন না। একাংশের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষ সমাজের অন্যায়, অবিচার আছে, যথেষ্টই আছে। কিন্তু যেখানে সুবিচার আছে, সুভাবনা আছে সেটা কেউ তুলে ধরেন না। ধরলে বোঝা যেত — ভালো মন্দ মিশিয়েই সমাজ — তা সেকালেও সত্য, একালেও সত্য। আপস্তম্ব লিখেছেন — স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মর্যাদার কোনো তফাত নেই — জায়াপত্যোর্ন বিভাগো বিদ্যতে। বিবাহের সময় থেকে সংস্কারের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সহ-ভাব উৎপন্ন হয়, একতরের মরণেও তা যায় না। সংস্কার কথাটার তাৎপর্যই এখানেই। সংস্কারের তাৎপর্য যদি গুণাধানের মধ্যে থাকে, তাহলে সংস্কার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই গুণাধান ঘটে যায়। তাই বিবাহ-সংস্কার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী-পুরুষের সহ-ভাবত্ব সম্পন্ন হয়, একতরের পতনে বা মরণেও সেই সহত্বের মর্যাদাটা থেকেই যায় — বিবাহস্য সংস্কারত্বাভিধানাৎ একতরস্য পতনে'পি অনপগমাৎ।

বস্তুত এই সহভাব যেমন ধর্মপালনে, তেমনই অন্য কর্মে এবং অবশ্যই সন্তান উৎপাদনে। তাই বলে বিবাহের মধ্যে যে শারীরিক মিলনের সুখ আছে সেটাও ভুলে যাননি প্রাচীনেরা। তাঁরা বলেছেন — সংস্কারের দৃষ্টিতে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মপালন এবং প্রজাসৃষ্টি হলেও তার লৌকিক ফলটা হল শারীরিক সুখ — রতিফলং তু লৌকিকমেব — সে সুখও আসে সহবাসে। অর্থাৎ আপস্তম্বের সর্বকর্মে স্ত্রীর সহত্ব এখানে লৌকিক, যা চোখে দেখা যায়, শরীরে অনুভব করা যায়। এই সহত্বের কথাটা স্মার্ত বৃহস্পতি বলেছেন আর-এক ভাবে। মনে রাখা দরকার, স্মার্তদের একাংশ আচার-বিধির ব্যাপারে কুশল, অন্যাংশ ব্যবহারে অর্থাৎ আইন-কানুনের ব্যাপারে। বৃহস্পতি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্যতম আইনজ্ঞ। তিনি বলেছেন — মনুষ্যশরীরের অর্ধেক হলেন ভার্য্যা, পুণ্য এবং অপুণ্য দুই কর্মেই তিনি সমান অংশীদার — শরীরার্ধং স্মৃতা ভার্য্যা পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।

আশ্চর্য হবেন শুনে যে, এই সব বচন থেকে সম্পত্তি লাভের ভাবনাটাও এসেছে প্রাচীনদের মনে। অনেকেই বলেন — স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী নাকি স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেত না। কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-সংস্কারজাত সহভাব এবং সমত্ব এখানেও স্মরণীয় বিশেষত মনুর মতো কট্টর মানুষও যেখানে এই সমত্ব লঙ্ঘন করেননি — কারণ তাঁর মতে যিনি ভর্তা তিনিই স্ত্রী — যো ভর্তা সা স্মৃতাঙ্গনা — তাই স্বামী মারা গেলেও তিনি অর্ধশরীরে বেঁচে থাকেন — এই হল আইনজ্ঞ স্মার্তদের মত। তাঁরা বলেন — স্বামী যদি অর্ধশরীরে বেঁচেই রইলেন, তাহলে অন্য লোকে তাঁর সম্পত্তি পায় কী করে, সম্পত্তি পাবেন স্ত্রীই — জীবত্যর্ধশরীরে অন্যঃ কথং ধনং সমাপ্নুয়াৎ।

সমস্ত সংস্কারের মধ্যে বিবাহকে যে কেন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বলা হয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্যই আমি এই সংস্কারের আচারাংশে এখনও যাইনি, শুধু সংস্কারলাভের আইনি দিকটায় গেছি, কেন না সেটাই আধুনিকতার নিরিখে বেশি প্রয়োজন। বিবাহের আচারাংশে এতই রোমান্টিকতা আছে, মন্ত্র-তন্ত্র এবং বিবাহবিধির মধ্যে এতই মধুরতা আছে যে, তা লিখতে গেলে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি যত শব্দে লিখেছি, তত শব্দই প্রয়োজন হবে এখানে। সবচেয়ে বড়ো কথা — আজ থেকে তিন-চার হাজার বছর আগে ঋগ্‌বেদের যে মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে একটি নর-নারীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল, আজও বিয়ের সময় সেই মন্ত্রই বলছি আমরা। অতএব সেই মন্ত্রবর্ণের তাৎপর্য যদি এখানে ব্যাখ্যা করতে হয়, তা হলে বিবাহ শব্দের তাৎপর্য, কন্যা-চয়ন, কন্যা-সম্প্রদান, ভার্যাত্ব, স্বামীত্ব সবই একে একে ব্যাখ্যা করতে হবে। মুশকিল হল — অতশত ব্যাখ্যার জন্য একটা বড়ো বই লিখলেই ভালো হয়, অতএব এই দায় নিয়েই প্রবন্ধ শেষ করতে হচ্ছে।

সমাজ, ব্যবহার এবং আমাদের শ্রুতিমূল

আমরা যারা সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শন নিয়ে একটু-আধটু মুখর হয়ে পড়ি, তাদের উদ্দেশে অনেক মানুষের দিক থেকেই একটি আক্ষেপ-বাক্য ভেসে আসে। বাক্যটি এইরকম –- সবই ব্যাদে আছে। বোধ হয় বহু পূর্বকালে আমারই মতো কোনো এক বৃদ্ধ বাঙাল ভ্রষ্ট বাঙাল উচ্চারণে এই উক্তি করেছিলেন কোনো এক প্রগতিশীল মানুষের উদ্দেশে। প্রগতিবাদী হয়তো বা 'ফিজিক্সের বিগ্ ব্যাং থিওরি' বোঝাচ্ছিলেন তাঁকে, অথবা বোঝাচ্ছিলেন বিমান চলার রহস্য। আর সেটা শুনেই আমার অতিবৃদ্ধ-পিতামহ-জাতের সেই বাঙাল বৃদ্ধটি আপন সংস্কৃত জ্ঞানের উচ্ছ্বাসে বলে ফেলেছিলেন — আপনি যা কইতে আছেন, তা সবই আমাগো ব্যাদে আছে, সাহিত্যেও আছে। বৃদ্ধ বাঙালের সেই উচ্ছ্বাস পরিশীলিত প্রগতিশীল সেই মহা-মানুষটি তেমন করে অনুধাবন করেননি এবং সেই থেকে তাঁরই স্বজাতীয় বান্ধবেরা সংস্কৃত জানা উচ্ছ্বাসিকদের উদ্দেশে ওই আক্ষেপ-বাক্য উচ্চারণ, পুনরুচ্চারণ করে চলেছেন — 'ব্যাদে আছে, সবই তো আপনাগো ব্যাদে আছে, তাই না?'

বাঙাল-বুড়ো আর কথা বলে না, আর এমন আক্ষেপ-ব্যঙ্গের পর কী-ই বা বলার থাকতে পারে। সত্যি বলতে কী, খুব গোঁড়া এবং কট্টর

ধর্মপন্থী না হয়েও যদি একটু তটস্থ হয়ে বিচার করি, তাহলেও একটা কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ সমস্ত জন-জাতি তাদের জীবন এবং সংস্কৃতির উৎস সন্ধান করে চলেছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে ভাবলে এটা তো মানতেই হবে যে, বেদ-বেদান্ত আমাদের প্রচীনতম সাহিত্য, এমনকী সারা বিশ্বে বেদই বোধ হয় প্রথম ছন্দোবদ্ধ বিপুল কবিতার সমাহার। আর সাহিত্য, কবিতা যেহেতু সমাজ এবং লোক-জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি, তাই আমাদের প্রাচীন ভালো-মন্দ, প্রাচীন ভাব-ভালোবাসা, ঘৃণা- ক্ষোভ, ক্রোধ-লোভ এবং অবশ্যই দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙক্ষা-ভয়, নীতি-অনীতি — সবই বেদের মধ্যে লুকিয়ে আছে অন্দরে-কন্দরে। জীবনের চলচ্ছবি বলেই পরবর্তী কালের মানুষেরা বড়ো বিস্ময়ের সঙ্গে বেদের দিকে তাকিয়েছেন। বেদের প্রত্যেকটি শব্দ যে শব্দ-প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তার কারণও বোধহয় সেই প্রাচীন বিস্ময়। আমরা দেখেছি — আধুনিক জীবনের নানান ঘটনা, আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ন্যায়-নীতির ভাবনার মধ্যেও আমরা বৈদিক যুগের পূর্বচ্ছবি খুঁজে পাই বলেই পদে-পদে সেই প্রাচীন বিস্ময় কাজ করে। বৈদিক পদ-বাক্যকে তাই প্রমাণ হিসেবে টেনে আনি বারবার। নিজের অজান্তেও আমাদের আচার-ব্যবহার, নীতি-যুক্তির মধ্যে বৈদিক সংস্কার এবং বিশ্বাস এমনভাবে অন্তঃক্রিয়া করে, বৈদিক অনুষঙ্গগুলি এমনভাবেই জুড়ে আছে আমাদের সমাজ, রাজনীতি এবং জীবনের বিকীর্ণ পরিসরে যে, বেদকে আমরা কোনোভাবেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আর সেইজন্যেই হয়তো বার-বার সেই উচ্ছ্বসিত উচ্চারণে আবর্তিত হয় — 'সবই ব্যাদে আছে।'

আমাদের জীবন এবং নীতির জগতে বেদ আছে প্রত্যক্ষে, বেদ আছে পরম্পরায়। যেভাবেই হোক বেদের প্রামাণ্যের প্রশ্ন এখানে উঠবেই, যদিও সেটা এমনই বহু চর্চিত বস্তু যে, সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করতে আমাদের ভালো লাগে না। তবু কথাটা আমাদের তুলতেই হবে। প্রশ্ন হল, প্রামাণ্য কাকে বলে? পণ্ডিত জনে বলেছেন — যথার্থ বা সম্যক্ জ্ঞানের

উপায়ই হচ্ছে প্রমাণ। যে উপায়ের দ্বারা কোনও বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, সেটিই প্রমাণ। জ্ঞানের যাথার্থ্যই হচ্ছে তার উপায়ের প্রামাণ্যের নিশ্চায়ক। জ্ঞানের যাথার্থ্য আবার কীরূপ? জ্ঞানের বিষয়টি বস্তুত যেরূপ, জ্ঞানে যদি ঠিক সেইরূপেই প্রকাশিত হয় তাহলে জ্ঞানটি যথার্থ হয়। প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্যক জ্ঞান আমরা লাভ করি। কিন্তু বেদের ব্যাপারটাই অন্যরকম। প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা যা জানা যায় না, সে বিষয়েও বেদ আমাদের প্রমাণ। বেদ হল স্বতঃপ্রমাণ, সে অলৌকিক বিষয়ের প্রতিপাদক। ভারতীয় ভাবনা-মতে বেদ কোনো মানুষ রচনা করেনি, বেদ অপৌরুষেয় এবং মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি — দুয়ে মিলেই বেদ — মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।

বেদের পর আমাদের উপনিষদগুলিও শ্রুতির মর্যাদা লাভ করেছে এবং আমাদের করণীয় কর্তব্য বিষয়ে বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্রগুলিও প্রমাণের মর্যাদা লাভ করেছে। তবে কিনা সাধারণ মানুষের জীবন এবং আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং স্মার্ত বিধানগুলিকেও সামাজিক জনের আচার-ব্যবহারে যেভাবে চালিত করা হয়েছে, তাতে মাঝে মাঝে স্মৃতিগুলিকে শ্রুতিমূলক যত মনে হয়, তার চেয়ে বেশি মনে হয় বৈদিক নৈতিকতার অপভ্রষ্ট অতিশায়ন। উপনিষদগুলির মধ্যে মোক্ষধর্মী আধ্যাত্মিকতা যত সূক্ষ্ম দার্শনিক মাত্রায় পৌঁছেছিল তাতে শ্রুতির মর্যাদা লাভ করাটা সেখানে বৈদিক মন্ত্রব্রাহ্মণের চেয়েও অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে আমাদের পরিশীলিত দৃষ্টিতে বিচার করলে তথাকথিতভাবে চিহ্নিত বেদমূলক স্মৃতিগুলির প্রামাণিকতা যুক্তিসিদ্ধ অথবা বিচারসহ মনে হয় না। কিন্তু তবু সমাজের উচ্চতর শ্রেণির স্বার্থ-সাধনের জন্যই হোক, অথবা ধূসর বেদবচনগুলির অতিশায়নী প্রক্রিয়াতেই হোক, স্মার্ত আচার ব্যবহার বা নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে বেদই কিন্তু সব কিছুর মৌল উপাদান হিসেবে

স্বীকৃত হয়ে আছে। এ-ব্যাপারে মনুকথিত শ্লোকটি বহুলভাবে উচ্চারিত হয় এখনও —

বেদো' খিল-ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্‌বিদাম্‌।
আচারশ্চৈব সাধূনাম্‌ আত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥

এই শ্লোকটি বহুলভাবে উচ্চরিত হবার কারণও আছে। বস্তুত আমাদের সংস্কার, আচার, বিচার, নৈতিকতা সবকিছুই বড়ো গভীরভাবে ধরা আছে এই শ্লোকে। সবচেয়ে বড়ো কথা — সমাজ-জীবনের নানান ব্যবহারে বেদ এবং স্মৃতি ছাড়াও যে-সব ভিন্ন-ভিন্ন দেশাচার লোকাচার আছে, সেগুলিরও একটা পালনীয়তা এই শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয়। বেদ যে আমাদের সমস্ত ধর্মকর্মের মূল সে-কথা তো আমরা মেনেই নিয়েছি এবং তা মেনেছি এই কারণে যে, আমাদের প্রাচীন জনজাতির সব রকমের আচরণ, প্রায় সমস্ত হৃদয়বৃত্তি — ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ভালোবাসা, ভয় এবং সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদের ছত্রে-ছত্রে ধরা আছে। চলমান জীবনের এই সার্বিক প্রতিচ্ছবিই বলে দেবে আমরা জীবন দিয়ে জীবনের ঋণ শোধ করেছি। তেমন করে স্মৃতি-শাস্ত্রের কথাও আমাদের বলতে হবে। পূর্বানুভূত বস্তুর জ্ঞানই যেহেতু স্মৃতি, তাই স্মৃতি বলতে সেই সব অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মরণ করেন বেদবিৎ পণ্ডিতেরা, যেগুলি এককালে অন্যভাবে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মনু-স্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করার সময় স্বয়ং মনুর উদাহরণ দিয়েই বলেছেন — ভিন্ন ভিন্ন বেদ-শাখা অধ্যয়নকারী বহু শিষ্য এবং বহুতর বেদজ্ঞ মানুষের সঙ্গে মনুর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে বেদ-ব্যবহার জেনে, বিভিন্ন জায়গায় সেইসব বৈদিক প্রমাণ নিজে উপস্থাপন করে মনু তাঁর গ্রন্থ লিখেছেন। সেই কারণেই তাঁর গ্রন্থটি আমাদের জীবনের পালনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রমাণ বলে মানতে হবে।

ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রকার পণ্ডিতদের সঙ্গে বেদ-মন্ত্র এবং তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ফলে তাঁদের স্মৃতিগ্রন্থে বৈদিক ভাবনা এবং কর্মকাণ্ডের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে,

আর সেইজন্যই স্মৃতিগ্রন্থগুলি ভারতীয় জনজীবনের ইতিকর্তব্যতার প্রমাণ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ জীবনে চলার পথে 'এটা করো এবং এটা কোরো না' — এই সব বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের মতো রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ এবং স্মৃতিগুলিও প্রমাণ হয়ে উঠেছে। তর্ক উঠেছে অবশ্যই। প্রশ্ন উঠেছে স্মৃতিগ্রন্থ, ইতিহাস-পুরাণ — এগুলি যদি মূল বেদার্থকেই স্মরণ করায়, তবে মনুষ্যরচিত এই সব শাস্ত্রকে আমাদের ধর্মাধর্ম-নিরূপণের মধ্যে প্রমাণ হিসেবে মানবার দরকারটা কী? এখানে জৈমিনির মতো কট্টর মীমাংসক, যিনি বেদ-প্রামাণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব-ভাবনাতেই আপন শাস্ত্র এবং দার্শনিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, তিনি পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে এটাই বলেছেন যে, মানুষ যত বড়ো মানুষই হোক না কেন, মানুষের কথার মধ্যে দোষ আছে — দার্শনিক পরিভাষায় — ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ইত্যাদি। আর এই দোষ আছে বলেই সাক্ষাৎভাবে যা বেদ বা বেদ-বচনের মধ্যে, বেদ-ব্রাহ্মণের মধ্যে বিহিত হয়নি, তা প্রমাণ হিসেবে গণ্য নয় — ধর্মস্য শব্দমূলত্বাদশব্দম্ অনপেক্ষং স্যাৎ। কিন্তু বাস্তব জগতে যেমন আগে মানুষ কথা বলে, ভাষা তৈরি হয়, তারপর তার ব্যাকরণ-নীতি তৈরি হয়, তেমনভাবেই মানুষের অনন্ত কর্মকাণ্ড এবং বিশ্বাসের জায়গাগুলি দেখেই স্মৃতির প্রবচন তৈরি হয়েছে। ফলে জৈমিনিকে পরের সূত্রেই লিখতে হয়েছে —

অপি বা কর্তৃসামান্যাৎ প্রমাণম্ অনুমানং স্যাৎ। অর্থাৎ কিনা বেদপ্রামাণ্যবাদীরা বেদবিহিত কর্মের মতো স্মৃতি-বিহিত কর্মগুলির অনুষ্ঠানও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন। অতএব বেদার্থের অনুমাপক স্মৃতিগুলিও শিষ্ট-পরিগৃহীত বলে অবশ্যই প্রমাণ বলে মানতে হবে। ভট্ট কুমারিলের মতো কট্টর মীমাংসকও এই মত সমর্থন করে বলেছেন — বেদার্থের স্মরণ করেই বৈদিকেরা স্মৃতি প্রণয়ন করেছেন। বেদ এবং স্মৃতি উভয়েই ধর্মকৃত্যে সমানভাবে গৃহীত হয়। আর স্মৃতির মূলভূত বেদবচন অবশ্যই রয়েছে। অতএব স্মৃতিগুলিরও প্রামাণ্য স্বীকার করা উচিত। কুমারিলের ভাষায় —

বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমানত্বাৎ পরিগ্রহ-সমত্বতঃ।
সম্ভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং মানতোচিতা॥

এই দৃষ্টিতে দেখলে ভারতীয় নৈতিক এবং সামাজিক ঐতিহ্যের মধ্যে আমাদের বেদ-ব্রাহ্মণের অথবা উপনিষদের উত্তরাধিকার যতখানি আছে, স্মৃতিগুলিরও ঠিক ততখানি উত্তরাধিকার আছে।

মুশকিল হল, আমাদের সামাজিক গঠন এবং নৈতিকতার মধ্যে যে শ্রুতিমূল প্রোথিত আছে তা ওপর-ওপর দেখলে এটাই মনে হবে যে, স্মৃতিশাস্ত্রই আমাদের সমাজ এবং নীতির ভিত্তিভূমি বোধহয়। বিশেষত এই ধরনের সামাজিক ব্যবহার এবং নৈতিকতার উৎস-সন্ধানের ব্যাপারে বেদ-উপনিষদের প্রবচন আমাদের যত খুশি এবং যত গৌরবান্বিত করে, স্মৃতিশাস্ত্র তা করে না। খুব সামান্য একটা উদাহরণেই এটা টের পাওয়া যায়। আজকে বাড়ির কোনো বিবাহ-মঙ্গলে একটি হোম-যজ্ঞ করে ঘৃত-কাষ্ঠের হুতাশন তৈরি করা যায় এবং সেখানে যদি উদাত্ত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা যায়, তাহলে যে সামাজিক এবং সামগ্রিক শ্রদ্ধা মনের মধ্যে সাড়ম্বরে জেগে ওঠে, একটি জন্মাষ্টমীর উপবাস বা একদশীর তিথি-পালন সেই আড়ম্বর তৈরি করে না। শ্রদ্ধাও তত সৃষ্টি হয় না। আবার যে-সব স্মার্তবিধানের বাড়াবাড়িতে সমাজের মানুষগুলিই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তারাও যদি বৈদিক মূল খুঁজতে যায়, তাহলেও বিপদ আছে, কেননা বাড়াবাড়িটা সব সময়ই তৈরি করে সমাজের সুবিধাভোগীরা, সেখানে বৈদিক মূল সূত্রাকারে থাকলেও তার ওপর সমাজ-ভাবনা এবং নৈতিকতার প্রাসাদ তৈরি হয়ে যায়।

২.

একজন বাইরের লোক হিসেবে যদি আমরা আমাদের চতুর্বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি পড়ি এবং বুঝি, তাহলে কিন্তু এই প্রাচীন গ্রন্থগুলি এমন রূপে আমাদের কাছে ধরা দেবে না যাতে মনে হয় আমাদের চিরকালীন ধর্মগ্রন্থ একেবারে নীতিকথা এবং নৈতিকতায় পরিপূর্ণ। অন্তত নৈতিক ভাবনারাশি

যে-ভাবে বাইবেল কিংবা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে পাই, তেমনটি আমাদের চতুর্বেদে নেই। বেদকে যতই 'অখিল-ধর্মমূল' বলে আখ্যা দিন মনু, বেদ কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে খুব জীবন-সংগ্রাহক বা 'লাইফ-অ্যাফার্মিং' গ্রন্থ। এখানে যজ্ঞের মতো একটা সর্ব-আশা-পূরক কল্পতরুর ভাবনা আছে এবং সেটাই আমাদের কর্মমার্গের অন্যতম প্রযোজক বলে মনে করি আমরা। বৈদিক সমাজের মানুষগুলিরও কোনো প্রিটেনশন্ বা ভন্ডামি নেই। তাঁরা দেবতার কাছে নিজের জন্য, নিজজনের জন্য ধন-সম্পত্তি, গৃহ-বিত্ত-দারা সব চাইতে পারেন, এমনকি এগুলি তাঁদের কাছে দার্শনিক উন্নাসিকতায় কোনো হেয় বস্তু নয়। তাঁরা নির্মোহ দৃষ্টিতে বলতে পারেন — দ্যাখো, এই যে মানুষের ধন-সম্পত্তি এগুলি আমাদের মঙ্গল দান করে, এই যে আমাদের বাড়িটি এটা মঙ্গলের জন্য, এই যে পুত্র-কন্যা-বংশধারা, এটা আমাদের মঙ্গলের জন্য, আর এই গবাদি পশুগুলি (সেকালের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপাদান), এগুলিও আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক —

যদ্ বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ ভদ্রং গৃহা ভদ্রং প্রজাঃ ভদ্রং পশবো ভদ্রম্।

এই যে অনন্ত চাওয়া, এবং তা পাবার জন্য দেবতার স্মরণ — এইতো আমাদের প্রথম এবং প্রধান শ্রুতিমূল সমাজ। আমাদের ধন দাও, বিত্ত দাও, গোরু দাও, অশ্ব দাও, অন্ন দাও, মধু দাও, আমাদের সমস্ত শত্রু বিনাশ করো — এই রকম হাজারো প্রার্থনা বৈদিক মন্ত্রের বর্ণে-বর্ণে উচ্চারিত হয়েছে। আমরা তার উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে পারব না। বৈদিক কালে বহু দেবতার উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে এক দেবতার কেন্দ্রিকতায় সেই প্রার্থনাই আবর্তিত হয়েছে এইভাবে — রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। অতএব আর্ত হয়ে প্রার্থনা পুরণের জন্য দেবতার স্মরণ গ্রহণ করাটা রীতিমত বৈদিক, পৌরাণিক এবং আধুনিক অভ্যাস। তাছাড়া ওই প্রার্থনা পূরণের জন্য বৈদিককালে যে যাগ-যজ্ঞের বিধান ছিল, পরবর্তীকালে সেটাই ব্রত-নিয়ম-পূজার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু বৈদিককালে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের জন্য নিজেকে তৈরি করার যে প্রস্তুতি মার্গ ছিল অথবা সাধারণ জীবনচর্যার মধ্যেও নৈতিকতার বোধ নিহিত ছিল, সেখানে নিজেকে পাপমুক্ত রাখা ছাড়া আর কোনো নৈতিকতার গুরুভার ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষত মর‍্যালিটি বা নীতি বলতে আজকের দিনে যে বিশাল দার্শনিকতার পরিসর তৈরি হয়েছে এবং ভারতীয় নীতিধর্ম নিয়ে সেখানে গভীরভাবে তো বটেই, বিলক্ষণভাবেও চিন্তা করতে হবে। প্রথমত পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যে অর্থে মর‍্যালিটি শব্দের ব্যবহার করেছেন আমরা সে অর্থে নীতি শব্দের ব্যবহার করিনি। পাশ্চাত্য ভাবনায় মর‍্যালিটি বলতে যা বোঝায়, তা অনেকটাই উপযোগবাদ এবং সনাতন ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্মত মূল্যবোধের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। অথবা অ্যারিস্টটলের নৈতিক ক্রিয়া, যা অনেকটাই মানুষকে গুড হতে সাহায্য করে এবং যার ফল সাফল্য — 'টু বি মর‍্যাল ইজ্ গুড্, বিকজ্ ইট্ ব্রিঙ্স্ সাকসেস্' আমাদের মর‍্যালিটি ঠিক তেমনটা নয়।

আমাদের দেশে নীতি ব্যাপারটা এতই বিশদ এবং ব্যাপ্ত যে, তা নিজের এবং পরের সার্বিক মঙ্গলের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চারিত। মানুষের তৈরি যে সমস্ত নিয়ম, শৃঙ্খলা, সদ্‌বৃত্তি, সদাচার নিজেকে এবং পরকে একটা সামান্য স্তর থেকে উত্তম স্তরে নিয়ে যায় বা বিশিষ্ট সৎপথের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেটাই আমাদের নীতি। আবার নীতির মধ্যে যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সদবৃত্তি অনেকটা ব্যক্তিগত স্তরে থাকে — যাকে ম্যাক্স্ ওয়েবার বলেছেন — মর‍্যালিটি হল — কেবলমাত্র কঠোরভাবে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নীতির কুক্ষীকরণ। সেইগুলিই যখন অনেকের, অথবা এক বৃহত্তর সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার উপযোগী হয়ে ওঠে, তখন বোধ হয় সেই বিখ্যাত শব্দটা আমরা প্রয়োগ করি — ধর্ম। তাই বলে ধর্ম কোনো ব্যক্তিগত নীতি-বোধ নয়, এটা বলাটা চরম দার্শনিক ভুল হয়ে যাবে। কেননা মহাভারত যখন বলছে — তোমার করণীয় কর্তব্য তোমার পালনীয় ধর্ম তোমাকে একাই সাধন করে যেতে হবে, সেখানে কারো

সহায়তা পাবে না — এক এব চরেদ্ ধর্মং নাস্তি ধর্মে সহায়তা — তখন মনে হবে ধর্মও যেন খুব ব্যক্তিগত স্তরে থাকে এবং তার অবস্থা হয়তো 'নীতি'র তাৎপর্য থেকে তুলনামূলকভাবে অর্থহীন।

অন্যদিকে নীতিশব্দের ব্যাপ্তিও তো কিছু কম নয়। আমাদের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, চাণক্যনীতি থেকে আরম্ভ করে রামায়ণ-মহাভারতে নীতি-যুক্তির কোনো অভাব নেই এবং নীতি-শব্দটাও এমন এক ব্যাপ্ত-বিশদ অর্থে চিহ্নিত হয়েছে মহাভারতে যাতে মনে হবে সমস্ত ধর্মই নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মহাভারত বলেছে — যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করলে মানুষ ভদ্রলোকের পথ বা আর্যজনের জীবনচর্যা থেকে সরে আসে না, সেই সব উপায় আমাদের নীতিশাস্ত্রের মধ্যে কথিত হয়েছে—

যৈ র্যৈরুপায়ৈর্লোকস্তু ন চলেদ্ আর্যবর্ত্মনঃ।
তৎসর্বং রাজশার্দূল নীতিশাস্ত্রেভি'বর্ণিতম্॥

নীতি-শব্দটির এই ব্যাপকতার কারণেই প্রাচীনকালে রাজনীতি বা রাজধর্ম-বিষয়ক শাস্ত্রকে শুধুমাত্র নীতি-শব্দের মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে পলিটিক্যাল সায়েন্স-কে সমস্ত ভালো ভাবনার আধার হিসেবে দেখেছিলেন অ্যারিস্টটল। শেষ কথাটা তাই এইভাবেই বলা যায় যে, নীতি এবং ধর্ম এই দুটি শব্দই ভারতীয় দর্শন-ভাবনায় প্রায় একাত্মক তাৎপর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং সেই কারণেই প্রয়াত বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল লিখেছেন — এটা সত্যি যে মর্যালিটি ভারতীয় শব্দ নয় এবং এটির সমার্থক সংস্কৃত পরিভাষা পাওয়া সহজ নয়। এর নিকটতম ব্যবহারোপযোগী অথচ অস্বচ্ছ ও বিভ্রান্তিকর শব্দ হল 'ধর্ম'।

ঠিক এই রকম একটা বোধ থেকে আমরা যদি ভারতীয় জনজাতির নৈতিক এবং সামাজিক ঐতিহ্যের শ্রুতিমূলকতা ভাবনা করতে চাই তাহলে দেখবো — আমাদের আচার-আচরণ, কর্তব্য, সংস্কার এবং বিশ্বাসের মধ্যে এখনো বেদ-উপনিষদ এবং পৌরাণিক স্মৃতি নানা ভাবে কাজ করে। এই নৈতিকতার ঐতিহ্য এবং চলমানতার কথা যদি সবিস্তারে বলি, তাহলে বহু দৃষ্টান্ত-কন্টকিত একটা বিরাট বই হয়ে যাবে। অতএব এই প্রবন্ধে

খানিকটা দিক্-নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হব।

আমরা আগেই বলেছিলাম যে, একেবারে বৈদিক যুগে যখন যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে বৈদিকসমাজ নিজেদের জীবনযাপন সুকর এবং সহজ করতে চেয়েছে, তখন আক্ষরিক এবং বিশদর্থে নৈতিকতার সমস্ত বোধগুলি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং সেটা হল — পাপ না করা এবং সর্বথা নিষ্পাপ থাকা। বৈদিকদের কাছে 'ঋত' বলে একটি শব্দ ছিল — এ টাকে সাধারণ 'সত্য' হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে, এমন কী ঋতের বিপরীত যে 'অনৃত' বা 'অসত্য', তার উল্টোই 'ঋত' এমন ভাবনাও খুব সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। যদিও ধর্ম বলতে বেদের মধ্যে ঋত, সত্য, ব্রত ইত্যাদি পর্যায় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও আমরা এগুলিকে অন্তত ঋত-শব্দের অপপর্যায়ই মনে করি, কেননা বৈদিককালে ঋতই হল সেই ব্যাপ্ত-গভীর শব্দ যেটাকে পরবর্তী কালের নীতি বা ধর্মের মতো বিশাল এবং ব্যাপ্ত মনে হয়।

ঋত শব্দটি বৈদিক কালে যেখানে মর‍্যালিটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ আছে যম-যমী সংবাদে। বলা উচিত, সেটা সভ্যতা সৃষ্টির প্রথম প্রকরণ ছিল, তাই যম আর যমীর মতো ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্কের মধ্যে একটা ইনসেশ্চুঅ্যাস্ রিলেশন্ তৈরি হবার পরিসর তৈরি হচ্ছে এবং যম সেই সম্পর্কের বাধা তৈরি করেছেন ঋতের কথা বলে — ঋতা বদন্তো অনৃতং রদেম। এখানেই আছে সেই পাপের কথাও যে পাপ থেকে বিরত থাকতে চাইছেন যম — পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিযচ্ছাৎ। এখানে ঋত শব্দের মধ্যে যে নৈতিকতার রূপ পাওয়া যায় এটা অনেকটাই মর‍্যালিটির জায়গা এবং বার্টান্ড রাসেল এক সময় বলেছিলেন মর‍্যালিটির যত জায়গা আছে তার মধ্যে যৌনতাই বোধহয় অন্যতম, যেখানে মর‍্যালিটির প্রশ্নটা বেশী করে ওঠে — মোর্ কন্সার্নড্ উইদ্ সেক্স দ্যান্ এনি টপিক্।

ঋগ্‌বেদের যম-যমী সংবাদে যে ঋত সেক্সুয়াল মর‍্যালিটি অথবা একটা অবৈধ যৌন-সম্বন্ধের নিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই ঋত

বেদের অন্যত্র মানুষের সামগ্রিক নৈতিকতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যে ঋতের পথ দুষ্কৃত পাপকর্মা মানুষ পার হতে পারে না — ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ এবং ঋতের পবিত্র তন্তু সর্বত্র বিস্তৃত হলে পণ্ডিতেরা তার চারপাশ ঘিরে থাকেন। পাপ এবং অন্যায়ের বিপরীতে ঋতের প্রতিষ্ঠা বেদের মধ্যে এমনভাবেই হয়েছে যে, ঋগ্‌বেদের প্রথম পর্যায়েই ঋত দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত, এমনকি ঋগ্‌বেদের সর্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্রের সঙ্গে একই সূক্তের মধ্যে আহূত হচ্ছে ঋত —

ঋতেন দীর্ঘ মিষণন্ত পৃষা ঋতেন গাবো ঋতমা বিবেশুঃ।।
ঋতং যেমান ঋতমিদ্‌বনোতি ঋতস্য শৃষ্ণস্তুরয়া উ গব্যুঃ।
ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে ঋতায় ধেনু পরমে দুহাতে।।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে ঋত যেন এক সর্বশক্তিমান নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠছে, এবং এই ঋতের জোরেই মিত্র এবং বরুণ, যাঁরা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন পাপের জন্য পাশবদ্ধ করে শাস্তি দেন, তারা ঋতের শক্তিতেই জগৎ এবং অন্যান্য সব কিছু ধারণ করেন — ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বিরাজথঃ। লক্ষণীয়, বৈদিক কালে ঋত যেমন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত, মহাকাব্য মহাভারত-রামায়ণের কালে ধর্মও ঠিক একইভাবে দেবতা হয়ে গেছেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা যে ধর্ম তাঁর কোনো রূপ নেই, চেহারা নেই ইন্দ্র, বায়ু বা অশ্বিনীকুমারদের মতো। কিন্তু ধর্মও সেই বৈদিক ঋতের মতোই এক সর্বনিয়ামক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং তার পরম্পরা বেদ-উপনিষদ থেকেই নেমে আসছে।

যে-কথা আগে বলছিলাম — পাপ করা এবং পাপবোধ — এটাই বোধহয় এখন পর্যন্ত মানুষের চেতন — অবচেতনের সবচেয়ে বড়ো খেলা, অথবা এটাই সবচেয়ে বড়ো নৈতিকতার রাজ্য, যা এখনো মানুষকে বিব্রত করে। এটার শ্রুতিমূল খুঁজতে যাওয়াটা অনেকটা সেই আধুনিক মানুষের মানসলোক উদ্ধার করতে যাওয়া — যে মানুষ কর্তব্যে অবহেলা করে ভগবানকে ডাকে মনের পাপস্খালনের জন্য, যে মানুষ অন্য-স্ত্রীসঙ্গ করে পাপবোধে ব্যাকুল হয় অথবা সামাজিক পরিবেশ, বাহ্যজগতে নানা

পাপানুষঙ্গ পরিহার করতে না পেরে অবশেষে ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়। আগে বলেছি, এবং আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে, পাপ করলে যিনি আপন পাশে বদ্ধ করেন, সেই বরুণই ঋত-ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই কারণেই বশিষ্ঠ-ঋষির মন্ত্র-বর্ণের মধ্যে বরুণের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করার মন্ত্রণা আছে এবং আছে পাপমুক্তির জন্য, তাঁর আনুকূল্যের জন্য প্রার্থনা। বশিষ্ঠের এই আনুকূল্যশংসিনী প্রার্থনা আজও ভীষণ প্রাসঙ্গিক — আমি ভালো মনে কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখতে পাবো। আমি তোমার দেখা চাই এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই — আমি কী পাপ করেছি — পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষুপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছম্।

কী সরল মানুষ এই বৈদিক বশিষ্ঠ যিনি নিজের পাপবোধ নিয়ে পাঁচজন লোকের সঙ্গে কথাও বলেছেন এবং বাহ্যজনের যা স্বভাব — পঞ্চায়েতের মোড়ল অথবা অজ্ঞানী বিদ্বান — তাঁরা সহজে বিধান দেন। বশিষ্ঠ বলছেন — আমি নানান প্রশ্ন নিয়ে বিদ্বান-জনের-সঙ্গে দেখা করেছি — সমানমিম্মে কবয়শ্চিদাহু-রয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে — তাঁরা বিদ্বান ক্রান্তদর্শী, তাঁরা আমাকে বলেছেন — এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত গ্রাম্য সাধুবাবা, সশ্মশ্রু কাপালিক এইভাবেই দেবতার ক্রোধ ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু অন্যায়ী জন কিছুতেই যেমন নিজের মন থেকে নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে সপ্রমাণ করতে পারে না বা করতে চায় না, ঠিক সেইভাবেই বশিষ্ঠ বলছেন — আমি কী এমন করেছি, যাতে বন্ধুর মতো এতকালের স্তোতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ — কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্। তুমি বলো আমি কী পাপ করেছি, যাতে তাড়াতাড়ি তোমার কাছে নত হয়ে ক্ষমা চেয়ে পাপ দূর করতে পারি।

বশিষ্ঠ তাঁর পাপমোচনের সূত্রে তৎকালীন দিনের কতগুলি পাপের নমুনা দিয়েছেন। যেমন শরীরের দ্বারা কৃত পাপ — যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ। পশুখাদক চোরেরা খাবার জন্য যে পশু চুরি করে নিয়ে যায়। গোরুর

বাচ্চা বা গোবৎসদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখাটাও পাপের মধ্যে গণ্য। অবশেষ কথাটা 'অসম্ভব বাস্তব।

ইচ্ছে না থাকলেও যে পাপ কখনো অন্যের প্রভাবে তৈরি হয়, সে-কথা জানিয়ে বশিষ্ঠ বলেছেন — এমনও তো পাপ আছে যা আমি নিজে করিনি, কিংবা ইচ্ছা করে করিনি, হয়তো সে পাপ ভ্রমবশত ভুল বুঝে হয়েছে, হঠাৎ মাথা গরম করে ক্রোধবশত হয়েছে, দ্যূত ক্রীড়ায় জুয়ো খেলতে গিয়ে হয়ে গিয়েছে অথবা হয়েছে মদ্যপানের ঘোরে। আবার এমনও হতে পারে যে, এই পাপ আমি নিজে মোটেই করতে চাইনি, কিন্তু আমার চেয়ে বয়সে বড়ো যারা, তারাই আমাকে এই পাপের পথে নিয়ে এসেছে — অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে/স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রযোতা।

বশিষ্ঠের এই অম্লান স্বীকারোক্তির মধ্যে একটা চরম আধুনিকতা আছে। চুরি করার মধ্যে যদি অন্যায়ের বৃত্তি থাকে, তবে যথেচ্ছ মায়ের দুধ খাওয়া বারণের জন্য বাছুরটাকে বেঁধে রাখার মধ্যে যে পাপবোধ, এটা মানবিকতা; সমাজ সহকারী পশুজগতের জন্য মমত্ববোধ। তার মানে, মানবিকতার অবক্ষয়ও এই সময়ে পাপের মধ্যে গণ্য, যা আজকের দিনে আমাদের ভাবতেই হচ্ছে। আর মদ্যপান, জুয়াখেলা অথবা হঠাৎ ক্রোধে যে অন্যায় সংঘটিত হয়, তার একটা পশ্চাত্তাপ আছেই, যেটা অনেক সময়েই আমরা দেখতে পাই। আর ওই যে শেষ কথাটা — বড়োরা আমাকে পাপের পথে নিয়ে গেছে, আমি নিজে চাই নি, কিন্তু সঙ্গদোষে অন্যেরা আমাকে অন্যায় কাজে প্রবর্তিত করেছে, এই বৈদিক পংক্তিটি আমাকে আধুনিক একটি নীতিবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে বলা আছে — কেউ অজ্ঞানবশত না জেনে না বুঝে খারাপ হয়। কেউ খারাপ হয় ভ্রমবশত, নিজের ভুলে। কেউ আবার খারাপ হয় তাদের জ্ঞান অবলুপ্ত হবার জন্য (স্মরণীয় সুরা, জুয়া, ক্রোধ)। আর কাউকে নষ্ট করে অন্য নষ্ট লোকেরা—

কেচিদজ্ঞানতো নষ্টাঃ কেচিন্নষ্টাঃ প্রমাদতঃ।
কেচিদ্ জ্ঞানাবলেপেন কেচিন্নষ্টৈস্তু নাশিতাঃ॥

লক্ষণীয়, পূর্বোক্ত বশিষ্ঠের পাপ-ভাবনার মধ্যে এথিক্স্ কিংবা মর‍্যালিটির দার্শনিক চেতনা যত আছে, তার চেয়েও বেশী আছে সেই পাপবোধ যা চিরন্তনভাবে মানুষকে পীড়িত করে বিব্রত করে। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেছেন যে, বৈদিকদের কাছে এথিক্স্ বা মর‍্যালিটির ধারণা গার্হস্থ্য পরিসর থেকে আর বেশী দূর এগোতে পারেনি। এমনকী এই মন্তব্যটাও করা হয়েছে যে, বেদিক রিলিজিয়ন ওয়াজ প্রিএমিনেন্টলি রিচ্যুয়ালিস্টিক্ অ্যান্ড ইমপ্লিসিট্লি ইম্মর‍্যাল। এই ভাবনার সমর্থনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সে সব ঋক্মন্ত্র উদ্ধার করেছেন যেগুলির মাধ্যমে বৈদিকেরা শত্রুর অনৈতিক ব্যবহারের জন্য তাঁদের মৃত্যু কামনা করেছেন। পাশ্চাত্যেরা একবারও ভাবলেন না যে, এখানে অন্যের অনৈতিক ব্যবহারগুলিই তাঁদের মনে প্রতিহিংসার জন্ম দিচ্ছে। বস্তুত অন্যের অনীতি — যারা অন্নের সার নষ্ট করে দিচ্ছে, যারা তাঁদের অশ্ব-গাভী এবং সন্তানদের ক্ষতি করছে — তাদের অনৈতিকতাই কিন্তু এখানে পরোক্ষে নীতিবোধ। অন্যের অন্যায়ের জন্য এখন আমরা রাষ্ট্রশাসনের স্মরণ গ্রহণ করি, বৈদিকেরা সেখানে দেবতার শাসন কামনা করছেন। কিন্তু শত্রুর ধ্বংসকামনার সঙ্গে -সঙ্গেও এই নীতি উচ্চারণ চলছে, যেখানে বৈদিক বলেন — সোমদেব কখনো পাপকারীকে উচ্চতায় প্রবর্তিত করেন না, মিথ্যাবাদী বলবান পুরুষকেও নয় — ন বা উ সোমো বৃজিনং হিনোতি। ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম্।

কথা না বাড়িয়ে যদি বিবর্তনের সূত্রে আসি তাহলে দেখব — বৈদিকদের এই ঋত, সত্য, পাপ না করা, মিথ্যা না বলা, মিথ্যাচার না করা — এই সব নৈতিক ভাবনাগুলি ঔপনিষদিক আত্মানুসন্ধানের ক্ষেত্রে একেবারে গৌণ হয়ে উঠলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মূলপর্বে 'শমদমাদি সাধন-সম্পদ' কিন্তু চতুঃসাধনের অন্যতম। উপনিষদ যখন — পাপ-পুণ্য, নীতি-অনীতির ঊর্ধ্বে সেই পরমতত্ত্বের কথা বলে, সেখানেও কিন্তু প্রিকন্ডিশন

হিসেবে সেই পরম নৈতিকতা থাকে — যানি অনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যানি অস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। ফলত যেটা বলতে চাই সেটা হল — সত্য বাক্য, সত্য আচার, অনৃতের উপশম, সদ্‌বৃত্তি, সদাচার — এই সব সাধারণ নৈতিকতা বেদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নীতিগতভাবে একইরকম এবং এগুলির বিচার করে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যের শ্রুতিমূল অন্বেষণ প্রকৃতপক্ষে নীতি এবং সমাজ বিচারের অতি সরলীকৃত প্রক্রিয়া। বরঞ্চ বলা উচিত, যে সামাজিক পরম্পারায় আমরা জন্মাই, বড় হই, বিদ্যা লাভ করি, বিবাহ করি এবং অবশেষে পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়ে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ হতে হতে মরণ বরণ করি — এই সব বিচিত্র জীবন গতির মধ্যে এখনও অনন্ত বৈদিক অভ্যাস বাহিত এবং সংক্রমিত। অনেক সময়েই যেমন আমরা বহুশ্রুত শব্দ ব্যবহার করি, অথচ তার অর্থ জানি না তেমনই আমাদের অনন্ত সামাজিক ব্যবহার, এমনকি মনস্তত্ত্বের মধ্যেও বৈদিক মূল শিকড় গেড়ে আছে, আমরা খবর রাখি না অথবা সে-খবর জানার চেষ্টাও করি না।

মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক ঋষিরা মন্ত্র দর্শন করেছেন, দৃষ্ট মন্ত্রে দেবতার স্তব করেছেন, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছেন। সেই সব মন্ত্র বর্ণের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কোনো সামাজিক ব্যবহারের পালনীয়তা নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু বেদ বা শ্রুতির দৃষ্টান্ত মেনে কর্তব্যাকর্তব্যের বিধিনিষেধ স্থির করেছেন ধর্মসূত্রকার, গৃহ্যসূত্রকার, আরও পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্রকারেরা। আমাদের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে জাতিভেদ আছে, আছে দশবিধ সংস্কার এবং আছে বন্ধু-বান্ধব, ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং শাসন-প্রশাসন। বেদ, অথবা বেদানুগত স্মার্ত বিধান এখনও সেখানে বেশ প্রাসঙ্গিক।

জাতিভেদ — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কথাটা শুনলেই এখন ধ্বনি হয় বাতাসে। বলা হয় — আমাদের দেশের সবচেয়ে ঘৃণ্যতম বিধান বোধহয় শ্রুতি থেকেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমরা বলব — কথাটা

সঠিক নয়, বেদের মধ্যে প্রথম যেখানে এই চতুর্বর্ণের নাম পাই, সেখানে নেহাৎই খুব প্রতীকীভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কথা আছে, সেখান থেকে জাতিভেদের বৈধতা এতটুকুও প্রমাণ হয় না। আর যেটা প্রমাণ হয়, সেটা পৃথিবীর সব দেশে সমস্ত জাতির মধ্যে আছে। বেদ বলেছিল — সেই বিরাট পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল। কয়টি খণ্ড করা হল? তার মুখই বা কোনটা, হাত দুটোই বা কী? তার উরু দেশ? তার পা? উত্তর আসছে — ব্রাহ্মণ হল তাঁর মুখ। বাহু-দুটি রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। তাঁর উরু-দুটি বৈশ্য এবং পা-দুটি শূদ্র —

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যাকল্পয়ন্
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে।
ব্রাহ্মণো'স্য মুখসাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো'জায়ত॥

এখানে যে মানুষে মানুষে ভেদের কল্পনা করা হয়েছে, তা নিতান্তই একটা — সিম্বলিক্ সোশ্যাল স্ট্রাকচার যা প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজে সত্য। সবচেয়ে বড়ো কথা হল — তাঁর পা-দুটি থেকে শূদ্রের উৎপত্তি — অতএব শূদ্র হচ্ছে অধম, তাকে পায়ের তলায় জায়গা দাও — এ-সব কষ্টকল্পনা যাঁরা করেন, তাদের জানা দরকার — এটা প্রতীকী বর্ণনা বলেই এমন সব কথা এখানে এসেছে যে, চন্দ্রমা হল তাঁর মন, চোখ হল সূর্য। আর সেই পা যদি এতই খারাপ হবে, তাহলে পরের মন্ত্রেই — তাঁর পা-দুটো থেকে এই পৃথিবী-ভূমির উৎপত্তি — পদ্ভ্যাং ভূমিরজায়ত — এটাও তো খুব খারাপ কথা বলতে হয় তাহলে?

বেদের পুরুষসূক্ত অন্যান্য ঋগ্বৈদিক মন্ত্রের তুলনায় আধুনিক বলে দাবি করেছেন পণ্ডিতেরা। কিন্তু যে পরিমাণ দার্শনিকতায় তথা প্রতীকী উচ্চারণে এই পুরুষ-সূক্ত ভাবিত হয়েছে, তা জাতিবাদী পণ্ডিতদের মাথায় ঢোকে না। যে ব্যাপ্তি এবং বিশালতায় এখানে বলা হয়েছে — পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ — এই পুরুষই সব, তিনি চরাচরে ব্যাপ্ত, যা

হয়েছে এবং যা হবে সেই অনাদি অনন্ত কালও এই পুরুষ — তখনই বোঝা যায় কোনো কাউকে বড়ো করা অথবা কাউকে ছোটো করার উদ্দেশ্যে এই অসামান্য সূক্ত রচিত নয়। মহামহোপাধ্যায় পি.ভি. কানের মতো পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই মনে করেন যে বৈদিক এই সূক্তের মধ্যে জাতিভেদের কোনো উচ্চারণ নেই। যা আছে, তা হল, মানুষের স্বভাব, বুদ্ধি এবং প্রবণতার নিরিখে সমগ্র মনুষ্য-জাতির একটা বিভাগ বা কাঠামো তৈরি করা এবং সে বিভাগ নিতান্তই বাস্তব।

মুশকিল হল — পুরুষ-সূক্তের এই বিভাগ কল্পনা দুই ভাবে পরম্পরাপ্রাপ্ত হয়েছে — স্বার্থান্বেষী চতুর বুদ্ধিমানেরা মুখ-বাহুর মান্যতায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মহিমা বাড়াতে থাকলেন। ফলে স্মার্তদের ধারায় জন্মের সৌভাগ্যেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা নির্ধারিত হতে থাকল এবং শাসন-যন্ত্র ক্ষত্রিয়ের হাতে থাকায় শূদ্রদের দুরবস্থা বাড়তে থাকল। লক্ষণীয়, আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যে বৈদিক পুরুষ সূক্তের এই প্রভাব যে মনুষ্যদূষণ তৈরি করেছে, সেখানে অপব্যাখ্যাই বেশি দায়ী এবং দায়ী সে স্বার্থৈষণা, যা মানুষকে ক্রমে-ক্রমে জাতিভেদের অন্ধকারে নিয়ে গেছে এবং সে অন্ধকার এমনই, যা বেদের ভাষায় — তমসীবাপরং তমঃ — অন্ধকারের মধ্যে আরও এক অন্ধকার। এখনকার দিনের রাজনীতিতে এবং সমাজনীতিতে যে সংরক্ষণ ধারা গড়ে উঠেছে তফশীলি তালিকার মধ্যে আরও যে অনন্ত তালিকা তার মূল নিদান এই বৈদিক সূক্তের অপব্যাখ্যা। অথচ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য-শূদ্রের সঠিক এবং বেদমূলক ব্যাখ্যা তো আমাদের শাস্ত্র পরম্পরার মধ্যেই ছিল। ভগবদ্‌গীতার মধ্যে গুণ-কর্মের বিভাগ অনুসারে যে চাতুর্বর্ণ্যের কথা আছে। কিংবা মহাভারতের বহু জায়গায় অহিংসা, সত্য এবং শম-দমের অস্তিত্বের বিচারেই যে ব্রাহ্মণ্যের কথা আছে — এই পরম্পরাটা অনেকেই বুঝলেন না। তাতে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যের শ্রুতিমূলকতা সত্যিই সদর্থক হয়ে উঠতে পারত।

জাতিভেদ ছাড়া আর যে সমস্ত সামাজিক আচার-ব্যবহার, যেগুলির মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত চলি, সেগুলির আচরণীয় বিধান আপাতদৃষ্টিতে খুব ধূসর হলেও তার প্রাচীন মূল প্রোথিত আছে বেদ-পুরাণ-স্মৃতির মধ্যেই। বোধহয় ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ নেই, যেখানে তিন হাজার বছর আগের কালে বিবাহ-সময়ে যে বেদ-মন্ত্র পড়া হত, এখনও সেই সেই মন্ত্রই পড়া হয় বিয়ের সময়। মন্ত্রের মানে নাই বুঝলাম, তাৎপর্য নাই বুঝলাম, মন্ত্রের বিনিয়োগ-উপযোগও নাই বুঝলাম, পুরোহিতও না হয় অতি ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র বলে গেলেন, তবু হাজার হাজার মানুষ এখনও সেই মন্ত্র সহযোগেই বিবাহ করেন। পুরোহিত মন্ত্র বলেন, আমরাও বলি, অনেক সময় বিশ্বাস না থাকলেও বলি। আমি শ্রুত আছি — একটি বিবাহ-মণ্ডপে সদ্য সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করা একটি যুবক বিবাহ-সময়ে বৃদ্ধ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে ভুল ধরতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে রেগে বলে ফেলে — সব ভুল, সব ভুল হচ্ছে, এই বিবাহই অসিদ্ধ। বৃদ্ধ পুরোহিত এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, ক্রমিক আক্ষেপে তাঁরও বৃদ্ধ মেজাজ খরতর হচ্ছিল। যুবকের মুখে অসিদ্ধ শব্দটি শুনে তিনি বললেন — এই মন্ত্রেই আমি তোর বাপেরও বিয়ে দিয়েছি, সবই যদি ভুল, তবে তোর বাপের বিয়েও অসিদ্ধ এবং সেই সূত্রে তুই নিজেই অসিদ্ধ, তোর পুত্রত্বই অসিদ্ধ।

এই কথা থেকে বুঝতে পারি — মন্ত্র এবং আচার সবই বৈদিক কালের মতো না হলেও শ্রুতিমূল স্মরণ করাটাই এখানে সবচেয়ে প্রধান। বিবাহ বাদ দিলেও একইভাবে দেখুন, একটি বাচ্চার ছয়-কী-সাত মাস বয়স হল, আর অমনি আমরা ধুমধাম করে মন্ত্র-পুরোহিত সহযোগে মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করি। বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীলদের অজস্র গালাগালি সত্ত্বেও এখনো বেশ কিছু বামুন-ঘরে উপনয়নের ব্যবস্থা হয়। আর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এখনো প্রায় সার্বজনীন। আমার শুধু জিজ্ঞাসা হয় — এই যে তিনটি-চারটি বৃহত্তর সংস্কার আমরা সামাজিক জীবনে মেনে চলি — এর পিছনে যুক্তি-বুদ্ধি বা অনেক ক্ষেত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসও যে

আছে, তা আমার মনে হয় না। তবে যেটা আছে, সেটা হল চিরন্তন সংস্কার, পিতৃ-পিতামহক্রমে নেমে আসা কতগুলি অভ্যস্ত রীতি-নীতি-পদ্ধতি, যার অন্তরে শ্রুতিমূলকতা আছে, এবং পালনের কর্তব্যও বোধহয় সেইখানেই। পারলৌকিক মাহাত্ম্যের কারণে এই সব সংস্কার পালন করা হচ্ছে, এ-কথা আজকে অপ্রাসঙ্গিক, তবে মাহাত্ম্য যেটুকু আছে তা হল ওই বিশাল বটবৃক্ষ-প্রমাণ বেদশাস্ত্র যার ঝুরি নেমে এসে প্রোথিত হয়েছে আমাদের হাজারও সামাজিক এবং ব্যাবহারিক সংস্কারের মধ্যে।

আমাদের এখানকার সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এই সংস্কারগুলির কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য এখন আর তেমন অবশিষ্ট নেই। কেননা সংস্কারগুলি এখন সামাজিক উৎসবের রূপ ধারণ করেছে, অতএব তাদের সামাজিক তাৎপর্যের মধ্যেই সাংস্কারিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অবশ্যই সেই সাংস্কারিক তাৎপর্য উপভোগ করা নয়। বরঞ্চ এ হল এক অন্বেষণ — যে অন্বেষণ আমাদের অতি-প্রাচীন বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ভাবনালোকে নিয়ে যায়, আমাদের বুঝিয়ে দেয় — তারা কোন ভাবনায় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পদ্ধতিকে জীবনের অঙ্গ বলে ভেবে নিয়েছিলেন, এবং কেনই বা সেই সব কর্মকাণ্ড এখনো পর্যন্ত মানুষের ইচ্ছার মধ্যে টিকে আছে — কেননা তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড আমরা তাঁদের মতো করে না হলেও একভাবে অথবা অন্যভাবেও তা মেনে নিই, অথবা মেনে না নিলে বা মেনে নিতে না পারলে চেতনে-অবচেতনে কষ্ট পাই। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই সব রীতি-নীতি-সামাজিক আচারের মধ্যে যদি এতটুকুও দার্শনিকতা না থাকত, যদি না থাকত নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য ব্যাপ্ত এক মঙ্গল ভাবনা, তাহলে এতদিন এই সব আচার-সংস্কার টিকেই থাকত না। আমাদের পূজা-অর্চনা, মন্ত্র-তন্ত্র এমনকি প্রণাম-আশীর্বাদের মধ্যেও শ্রুতমূল লুকিয়ে আছে। সব তো এই ছোট্ট প্রবন্ধে ধরে দেওয়া সম্ভব নয়, তবু কথা কিছু কিছু।

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহ-এই তিনটি শব্দ এবং এই শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে আপনারা সকলেই

সুপরিচিত। কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলির পূর্বক্রমে মানুষের জীবনে আরও কতগুলি পারিবারিক অনুষ্ঠান হত যেমন গর্ভাধান, চূড়াকরণ, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি — যেগুলির ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের কারণে এবং জটিলতার কারণে সামাজিক ব্যাপ্তি তো লাভই করেনি, এমনকি সেগুলি পারিবারিক তথা ব্যাক্তিগত বিশ্বাসও লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই এই অনুষ্ঠানগুলির সম্যক পরিচিতিই সকলের কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ অন্নপ্রাশন, উপনয়ন — এগুলিকে যেমন সংস্কার বলে, তেমনই গর্ভাধান, পুংসবন — এগুলিও সংস্কার। সবচেয়ে বড়ো কথা, পূর্বোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড বা অনুষ্ঠানগুলির মূল তাৎপর্য যেমন অনেকের জানা নেই, তেমনই সংস্কার শব্দটির শাব্দবোধ এবং তৎপের্যও অনেকের জানা নেই।

সাধারণত মন্দির-সংস্কার পুষ্করিণী-সংস্কার, গঙ্গানদীর দূষণ-সংস্কার, এমনকি ভারতীয় সংবিধানের সংস্কার-সাধনের কথাও আমরা প্রায়ই আজকাল শুনে থাকি। এ-সব সংস্কারের কথায় সাধারণভাবে যা বুঝি, তাতে একটি একটি বিষয় বা বস্তু দূষিত হলে বা সমাজ তথা কালের সঙ্গে অসংলগ্ন হয়ে উঠলে আমরা তাকে দূষণমুক্ত করি বা পুনর্নবীকরণ ঘটাই। সাধারণ বুদ্ধিতে এটাই সংস্কার।

লক্ষণীয়, সংস্কৃত, সংস্কৃতি অথবা সংস্করণ একই ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন। অথাৎ সম্ পূর্বক কৃ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়গুলি কোথাও ক্ত (ত) কোথাও ক্তিন্ (তি), কোথাও ঘঞ্ (অ) অথবা কোথাও ল্যুট্ (অন)। কিন্তু বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগে উক্ত শব্দগুলি নিষ্পন্ন হলেও এবং তাতে শব্দার্থে কিছু অন্যরকম ভাব আসলেও, প্রত্যেকটি শব্দের অর্থের মধ্যেই কিন্তু পূর্বস্থিত বস্তুর দূষণ মোচন করে নবীকরণের তাৎপর্যটা আছে। এই দূষণমুক্তি এবং নবতর গুণ সংযোজনার ভাবটুকু কেমন করে এই শব্দগুলির মধ্যে অনুস্যূত হল তা সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যাবে খ্রিস্টপূর্ব যুগের ব্যাকরণ-বৈজ্ঞানিক পাণিনির এক সূত্র ব্যাখ্যা করলে।

পাণিনি সূত্র করেছেন — সংপরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে অর্থাৎ সম্ অথবা পরি পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর অলংকরণ অর্থে সুট্ আগম হয়। 'সুট্'-

এর সবটুকুই প্রায় বাদছাদ দিয়ে যে অংশ থেকে যায়, সেটা হল 'স্'। অর্থাৎ এমনিতে সম্ পূর্বক কৃ ধাতুর সঙ্গে ক্ত প্রত্যয় যোগ করলে শব্দটি হওয়া উচিত ছিল সংস্কৃত। একইভাবে হওয়া উচিত, ছিল সংকৃতি, সংকরণ, সংকার অথবা সংকারক। পাণিনির নিয়মে 'স্' মাঝখানে এসে পড়ার ফলেই শব্দগুলির রূপ দাঁড়িয়েছে সংস্কৃত, সংস্কৃতি, সংস্কার সংস্করণ অথবা সংস্কারক। তবে এই 'স্' আগম একটা শর্তেই হবে। তা হল ওই নিষ্পন্ন শব্দগুলির মধ্যে অলংকরণের অর্থটুকু থাকতেই হবে। ওই অর্থ না থাকলে সংকৃত মানে দাঁড়াবে মিশ্রিত, সংকর কথাটা যেমন ব্যবহৃত হয় জাতি-বর্ণের মিশ্রণের ক্ষেত্রে। শুধু অলংকরণ বোঝালেই তবে শব্দটা সংস্কৃত, কী সংস্কৃতি বা সংস্কার হতে পারবে।

জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে 'সংস্কৃত' এই শব্দটির এই অলংকরণ অর্থটা কীভাবে বোঝা যাচ্ছে? উত্তর হল — ভাষাটা আগে অমার্জিত অপরিশুদ্ধ অবস্থায় ছিল। পাণিনির মতো বৈজ্ঞানিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করে, সমাস, কারক-বিভক্তি এবং পদসাধনের ব্যবস্থা করে পূর্বপ্রযুক্ত 'ক্রুড' অবস্থায় থাকা ভাষার প্রত্যেকটি পদ নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছেন আমাদের। বৈদিক কালে ব্রাহ্মণ-উপনিষদের কালে যে ভাষা ব্যবহার হত, তা যত সুন্দরই হোক, ধাতু-প্রত্যয়-বিভক্তির ক্ষেত্রে সে ভাষার কোনও প্রায়োগিক শৃঙ্খলা ছিল না। পাণিনিই প্রথম তাঁর বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতাত্ত্বিক বিধানগুলির মাধ্যমে সেই ভাষার শোধন-মার্জন সম্পন্ন করে তাকে সজ্জন মনীষীদের ভাবধারণের উপযুক্ত করে তুললেন। সে ভাষার শব্দগুণ এমনই উচ্চস্তরে পৌঁছোল যে, বিদগ্ধজনেরা পাণিনির দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে দেবতাদের ভাষা বলে আখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন। এই শোধন-মার্জন-উন্নয়নই অলংকরণ যার ফলে 'স্'-এর আগম হয়।

পাণিনির যে সূত্রটি আমরা বলছি, তাতে সম্‌পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তরে অলংকরণ অর্থে 'স্'-এর আগম হবে, এইটুকুই বলেছেন পাণিনি। কিন্তু সম্‌পূর্বক কৃ ধাতুর সঙ্গে যে-কোনো প্রত্যয়যুক্ত একটি নিষ্পন্ন শব্দের অর্থের মধ্যে এই অলংকরণ বা নতুন কোনো গুণের যোজনা যে হচ্ছে,

সেটা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন বিশেষ বিশেষ জায়গায় 'সংস্কৃত' শব্দের কী অর্থ হয় তা বুঝিয়ে দিয়ে। পাণিনি অন্য দুটি সূত্রে সংস্কৃত শব্দটাই সোজাসুজি ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে একটি 'সংস্কৃতং ভক্ষাঃ' — এখানে রান্না বা পাকক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের যে উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে, সেইখানে সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহার করেছেন পাণিনি। অন্য সূত্রটিতে একটি মাত্র শব্দই আছে — 'সংস্কৃতম্'। সূত্রটা বোঝানোর জন্য বলি — ধরুন ভাত খাচ্ছি। এখন ভাতের সঙ্গে যদি দই মিশিয়ে নিই, তাহলে ভাতের আস্বাদন বাড়ল। তার মানে ভাতের সঙ্গে দই মাখার ফলে নতুন গুণ সংযোগ করা হল ভাতের আস্বাদনে। পাণিনির মতে দধির দ্বারা যেটা সংস্কৃত হল, তাতে তদ্ধিত প্রত্যয় হবে ঠক্ — অর্থাৎ শব্দটি হবে 'দাধিকম্'।

যে দুটি সূত্রের মধ্যে 'সংস্কৃতম্' শব্দটি আছে, সেই দুটি সূত্রের মধ্যেই বিশেষ এই শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত কাশিকাবৃত্তিতে বলা হয়েছে — যা আছে, অথবা যা বিদ্যমান, তেমন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে উৎকর্ষ নিয়ে আসাটাই সংস্কার — সত উৎকর্ষাধানং সংস্কারঃ। 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ সেটাই। বেশ বোঝা যায় সংস্কৃত, সংস্কার অথবা সংস্করণ এই শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত আভিধানিক অর্থে তফাৎ নেই কোনো। অবশ্য পাণিনি নয়, সংস্কার শব্দটার প্রথম তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাই পাণিনির বহু আগে ঋগ্‌বেদের মধ্যে। মজাটা হল শব্দটা সেখানেও সংস্কার নয়, সংস্কৃত। অর্থাৎ যা সংস্কার করা হয়েছে।

কখনও বেদের মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে, কখনও মন্ত্রপূত জলের ছিটে দিয়ে, আবার কখনও বা কোনো বস্তুর ওপর হাত রেখে মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই বস্তুকে যখন বৃহত্তর যজ্ঞাদি কর্মের জন্য যোগ্য করে তোলা হত, তখনই ভাবা হত, সেটি সংস্কৃত হয়েছে, অর্থাৎ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের দোষ অপসারণ করে তাকে বৃহত্তর কর্মের জন্য যোগ্য করা হয়েছে। কথাগুলো শুনতে যেন কেমন কেমন লাগছে, তাই পরিষ্কার করে বলি। সেকালের দিনে যাজ্ঞিকেরা পশুযাগ করতেন, একালের দিনেও মায়ের থানে পাঁঠাবলি হয়। কিন্তু পাঁঠাবলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানবেন নিশ্চয়ই

যে, পাঁঠাবলি মানে — বাজার থেকে একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে এসে — মা-মা বলে রামদা দিয়ে পাঁঠাটি কেটে ফেললাম, আর বলিকর্ম শেষ হল — তা নয়। খেয়াল করে দেখবেন — যে পাঁঠাটিকে বলি দেওয়া হবে তার লক্ষণ আছে। নিকষ কালো হলেই লক্ষণটা মেলে বেশি। তবে কালো — ধলোর থেকেও বড়ো কথা যেটা, সেটা হল — একটি পশুকে সংস্কারের মাধ্যমে বলিকর্মের উপযুক্ত করে তোলা। দেখবেন পাঁঠাটিকে স্নান করানো হয়, পাঁঠার মাথায় সিঁদুর দেওয়া হয়, কখনওবা তার গলায় জবার মালাও পরানো হয়। সঙ্গে দেখবেন, মন্ত্রও আছে। এসব কেন করা হয়? স্নান-মন্ত্র এবং অন্যান্য আচার-কর্মের মাধ্যমে, একটি সাধারণ পশুকে যখন দেবতার উদ্দেশ্যে বলির উপযুক্ত করে তোলা হল — তখনই বলা যেতে পারে যে, পশুটি সংস্কৃত হল।

শুধু পশুই নয়, যে যূপকাষ্ঠে বা হাঁড়িকাঠে পশুবলি হবে সেটিকেও জবার মালা পরানো, বা সিঁদুর লেপটে মন্ত্র পড়ার নিয়ম আছে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। সত্যি কথা বলতে কি, এ-সব নীতি-নিয়ম-সংস্কার আজকে তৈরি হয়নি। আচার-নিয়মে অনেক পার্থক্য থাকলেও যজ্ঞকার্যে ব্যবহার্য্য সমস্ত বস্তুরাজিকে সমন্ত্রে সংস্কার করে নেওয়াটা একেবারে প্রাচীন বৈদিক রীতি। পশুবলির কথা বললাম বলেই তার বৈদিক 'অ্যান্টিসিডেন্ট' দেখানো যায় বৈদিক পশুযাগের মধ্যেই। আমার ভাষায় না বলে মহামতি রামেন্দ্রসুন্দরের অনবদ্য ভাষায় বলি —

পশুবন্ধনের জন্য যূপের দরকার। এই যূপ কাঠের স্তম্ভমাত্র। অধ্বর্য্যু স্বয়ং ছুতারের সহিত বাহির গিয়া ডাল কাটিয়া আনেন। উহার ডালপালা ছাঁটিয়া অষ্টকোণ স্তম্ভ বা খুঁটি প্রস্তুত করা হয়। যূপ অন্যূন পাঁচ হাত দীর্ঘ হয়।... যূপের গায়ে ঘি মাখাইতে হয়। এই কর্মের নাম যূপাঞ্জন। তারপর দড়ি জড়াইতে হয়, এই দড়ির নাম রশনা।... প্রত্যেক কর্ম অধ্বর্য্যু সম্পাদন করেন, আর হোতা প্রত্যেক কর্মের অনুকূলে ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এইরূপে যূপ পশুবন্ধনযোগ্য হয়।

বন্ধনের পূর্বে পশুকে দুইগাছি কুশ দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়; ইহার

নাম উপকরণ। পশুর দুই শিঙের মাঝে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি যূপের রশনায় বাঁধিতে হয়। এইরূপ পশুবন্ধনের নাম পশু নিযোজন। পশুর কপালে ঘি মাখানো হয়।

তাহলে দেখুন, এই যে যূপকাষ্ঠ বা পশুটি, এগুলি সোজাসুজি যজ্ঞের কাজে লাগছে না। দড়ি জড়ানো, কুশ-ছোঁয়ানো এবং তাও সব মন্ত্র-সহযোগে — এই সমস্ত ভাবনা-রাশিই যজ্ঞকর্মে ব্যবহার্য্য বস্তু বা বিষয়ের দোষ অপসারণ অথবা নতুন গুণাধানের তাৎপর্যে গৃহীত। আসল কথাটা রামেন্দ্রসুন্দর যেমন বলেছেন — 'বেদপন্থী এই জীবনযজ্ঞের তত্ত্বটাকে খুব বড়ো করিয়া দেখিয়াছেন।....জগতের যাবতীয় দ্রব্যকে তিনি বড়ো করিয়া দেখেন; প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাকে খুব বৃহৎ করিয়া দেখিতে তিনি অভ্যস্ত।' এই অসাধারণ মানসিকতা থেকেই একটু জলের ছিটের সঙ্গে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেই সামান্য এবং সাধারণ বস্তুও অসাধারণে পরিণত হয়ে যেত যেন। সাধারণ বস্তুকে আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায় এই যে নবতর রূপ দেওয়া, এটাই সংস্কারের তাৎপর্য।

বৈদিক যাজ্ঞিকেরা যে বিশাল প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ করতেন, তার মধ্যে আড়ম্বর যতটুকু ছিল — সাধারণে এটাকে আড়ম্বরই বলবে — কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল সাধারণের মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা, এই ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক-ভাবনা — যে ভাবনায় স্রোতবহা নদী মধুমতী হয়, সমীরণ মধুস্পর্শী হয়ে ওঠে পার্থিব ধূলিকণা মধুময় হয়ে ওঠে। অন্যদেশের পিতা যখন বিবাহার্থিনী কন্যাকে আশীর্বাদ করেন, তখন তার মধ্যে স্নেহ কিম্বা সদ্ভাবনা কিছু কম থাকে বলে মনে হয় না, কিন্তু আমাদের পিতা যখন পতিগৃহগমনোদ্যতা কন্যার মাথায় হাত রাখবেন, তখন ধান লাগবে দু-চারটি, দূর্বা লাগবে দু-তিন গাছি, মাথায় হাত রাখার সময় পিতা ইষ্টদেবতার কাছে সজল চোখে প্রার্থনাও জানাবেন তাঁর কন্যাটি যেন সুখী হয়। বলতে পারেন, ধান-দুব্বো, ইষ্টমন্ত্র জপ অথবা দেবতার কাছে প্রার্থনা — এ-সব আড়ম্বর,

আসন বিছিয়ে বসি না। যদি বা বসিও,তবু সেটাতে বসেই পুজো আরম্ভ করা যায় না।

আসলে একটা পুজো আরম্ভ করতে গেলে তারও আরম্ভ আছে, এমনকী সেই আরম্ভেরও আবার আরম্ভ আছে। সব কিছু সেরে মূল পুজোর মন্ত্র এই এতটুকুন। পুজোর বিগ্রহ সামনে আছেন, আমি আছি, ফুল-তুলসী-চন্দন আছে, পুজোর আসনটিও আছে, অতএব সঙ্গে সঙ্গে পুজো আরম্ভ হয়ে গেল — এমন হয় না। আরম্ভের আরম্ভটা কীভাবে করতে হয়? পুজোর আসনে বসে আগে বাঁদিকে মাটির ওপর ছোট্ট করে একটি চতুষ্কাণ আঁকতে হবে। জল দিয়েই আঁকে সবাই, সেই চতুষ্কোণের মধ্যে একটি বৃত্ত এবং তার মধ্যে একটি ত্রিকোণ আঁকতে হবে। একে বলে মণ্ডল-রচনা। হয়তো এগুলি অতিপ্রাচীন যজ্ঞবেদির স্মারক-চিহ্ন। মণ্ডলাকারে অঙ্কিত ওই চিহ্নের ওপরে ফুলচন্দন দিয়ে বলতে হবে — আধারশক্তয়ে নমঃ।

আধার হল এই পৃথিবী, যা আমাদের ধারণ করে আছে, যার ওপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বসে আছি। সেই আধার শক্তির উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে সেই আধারশক্তির প্রতীকটি পূর্বে অঙ্কিত সেই মণ্ডলাকার ভূমির ওপর কোশা-কুশী রাখতে হবে। কোশায় জল ভরতি করে তাতে ফুল-চন্দন, আতপচাল, তুলসী বা বেলপাতা, দুর্বা এত সব রাখতে হবে। এবার কোশার ভিতরে যে জলটুকু দিলাম, সেই সামান্য জলটাকে পূজার যোগ্য করে তোলার জন্য সেই জলের মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলী উল্‌টো করে রেখে মন্ত্র পড়তে হবে — গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু কাবেরী — তোমরা সকলে এই জলের মধ্যে অধিষ্ঠিত হও। এই মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কোশার ওই সাধারণ জলটুকু আর সাধারণ রইল না। জলশুদ্ধির মন্ত্রে সে জল ভারতবর্ষের সমস্ত পবিত্র নদীর পবিত্র তীর্থজলে পরিণত হল পূজকের মনে। তার মানে, জলের সংস্কার করা হল। তার সাধারণত্বের দোষ দূর করে তীর্থজলের গুণ আধান করা হল।

এই তীর্থজল পূজোর যত সরঞ্জাম আছে, সবগুলির ওপর একটু

আধটু ছিটিয়ে দিতে হবে। এবারে কি পুজো চলবে? মোটেই না যে আসনে বসে আছি, তার তলায় ত্রিকোণ এঁকে আবারও গন্ধপুষ্প দিয়ে বলতে হবে — আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। অর্থাৎ আধারশক্তি পৃথিবীর উদ্দেশে যে অর্ঘ্যরচনা করেছিলাম, তাকে এবারে ছোট করে নিলাম নিজের মাপে। এখানে মন্ত্রটা পড়লেই বোঝা যাবে যে, পূজারী তাঁর সুস্থির স্থিতির জন্য জগদ্ধারিণী পৃথিবীর কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন। তিনি বলছেন — ভগবতী পৃথিবী! তুমি যেমন এই সমস্ত চরাচরের মানুষকে ধারণ করে আছ, আর তোমাকে যেমন ধারণ করে আছেন ভগবান বিষ্ণু, তেমনি তুমিও আমাকে সদা-সর্বদা ধারণ কর। আমার এই বসার আসনখানি তুমি পবিত্র করো।

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

সম্পূর্ণ শ্লোকটির মধ্যে ধরিত্রী-মাতার ধারণ-শক্তির এক ব্যাপ্ত ধারণা আছে। দেবার্চনাকারী পৃথিবীর ধারণ-শক্তির মধ্যেই নিজের আসনখানি সুস্থির এবং প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। পূর্বোক্ত শ্লোকের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম বলা হয়েছে মেরুপৃষ্ঠ এবং এই শ্লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কূর্ম দেবতা। মেরুপৃষ্ঠ নামে কোনো ঋষি ছিলেন কিনা ঐতিহাসিকভাবে তা প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ধারণা অনুযায়ী, গোলাকার পৃথিবীর মেরু-অঞ্চলটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অপিচ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্মদেবতা প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্না পৃথিবীকে আপন পৃষ্ঠে ধারণ করে এই মনুষ্যপ্রকৃতির চিরাবাসকে যে রক্ষা করেছিলেন, সেটাও একটা বিশ্বাস। অতএব কূর্মশরীর বিষ্ণুর ধারণ করা এই পৃথিবীর মেরুপৃষ্ঠে যে দৈব-আসন রচিত হয়েছিল সভ্যতার প্রাক্‌কালে, দেবতার আধুনিক সাধক সেই আসনখানির সঙ্গে নিজের ধূলিমলিন চিরাভ্যস্ত আসনে দৈনন্দিনতার যে লঘুভাব থাকে, সেই লঘুতা মোচন করে তাকে কমলাসনের মহিমা দেওয়াটাই এই আসনশুদ্ধির তাৎপর্য।

আমরা সংস্কার কথাটাকে অনেক ব্যাপ্ত-বিশদ অর্থে ব্যবহার করি বলে আসনের মতো সাধারণ একটি বস্তুর ব্যাপারেও শুদ্ধি কথাটা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মূলত শুদ্ধিও এক ধরনের সংস্কার। কারণ গোবিন্দানন্দের শুদ্ধিকৌমুদীতে বলা হয়েছে — বেদবোধিতকর্মার্হতা শুদ্ধিঃ — অর্থাৎ একটি বিষয় বা বস্তুকে বেদবিহিত-কর্মের উপযুক্ত করে তোলার নামই শুদ্ধি। সংস্কারের মূলার্থও তাই, বৃহত্তর কর্মের যোগ্য করে তোলা — যাকে গোবিন্দানন্দ বলেছেন 'অর্হতা'। আসনশুদ্ধির মতো পুজোর সময় পুষ্পশুদ্ধি করতে হয় কোশার জলের ছিটে দিয়ে এবং মন্ত্র পড়ে। অর্থাৎ এখানেও সাধারণ ফুলকে নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে দের্বাচনার উপযুক্ত করে তুলতে হয়।

আরও একটা ব্যাপার আছে যার নাম ভূতশুদ্ধি এবং মাতৃকান্যাস। আশ্চর্য হল দেবপূজার আগে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে ধ্যান-প্রাণায়ামের মাধ্যমে পুরাতন নিঃশ্বাস ছেড়ে নতুন নিশ্বাস নিয়ে নিজের দেহটাকে নবগঠিত একটি দৈবদেহে পরিণত করাই শুধু নয়, এখানে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণ উচ্চারণ করে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করতে হয়। মাতৃকা হলেন সরস্বতী, যিনি গায়ত্রীর প্রতিশব্দ। মাতৃকান্যাসে এই যে প্রতিবর্ণোচ্চারণের মাধ্যমে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ শুদ্ধ করে নেওয়া হয় — এটা হল নিজের শরীরের প্রাত্যহিক সংস্কার অর্থাৎ আসন, জল, ফুলের মতো নিজের শরীরটাকেও দেবপূজার উপযুক্ত করে নিয়ে তবেই পুজোয় বসতে হবে। অসাধারণ কথাটি রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় নিবেদন করি —

'তন্ত্রশাস্ত্র বেদপন্থীরা বাগ্‌দেবীকে শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্ত্রে তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী। ইনি শব্দাত্মিকা — অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে ইহার দেহ নির্মিত; প্রতি অঙ্গে কতকগুলি বর্ণ বা অক্ষর বসাইয়া ইহার শব্দময় — বর্ণময় দেহ নির্মিত হইয়াছে; অতএব ইনি পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলা! ইনি ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্র-শকলা — ইহার মস্তকে সোমকলা নিবদ্ধ হইয়া শোভা

পাইতেছে। এ সেই সোমকলা, বাগ্‌দেবী স্বয়ং যাহা আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এক হাতে মুদ্রা, এক হাতে অক্ষমালা, এক হাতে বিদ্যা, চতুর্থ হাতে সুধাঢ্য কলস, — অমৃতপূর্ণ কলস — ইহাও সেই সোমকলস, যাহা অমৃতরসে পূর্ণ। ইতি ত্রিনয়না — বিশদপ্রভা — আপীনতুঙ্গস্তনী। এমন রূপ আর হয় না। এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বময়ী; — যে-কোনো দেবতার পূজায় বসিয়া যিনি পূজক, তিনি আপনাকে এই মাতৃকা সরস্বতীর সহিত অভিন্ন মনে করেন — আপনার প্রতি অঙ্গে অ আ ক খ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ বিন্যাস করিয়া আপনার স্থূল দেহকে বাগ্‌দেবতার বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন; আপনার অন্তঃশরীরেও চক্রে চক্রে ওইরূপ বর্ণ বিন্যাস করিয়া অন্তর্দেহকেও বাগ্‌দেবীর বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন। তন্ত্রমতে পূজাকালে ভূতশুদ্ধির পরে এইরূপে মাতৃকা ন্যাস করিতে হয়। বাহিরের দেহে ও অন্তর্দেহে বর্ণ বিন্যাস দ্বারা বাগ্‌দেবীর শব্দময় বাঙ্‌ময় দেহ রচনার নামই মাতৃকান্যাস। এইরূপে পুজায় বসিলে পূজকের সহিত বাগ্‌দেবতার অভিন্নতা কল্পিত হয়। জীবের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য কল্পিত হয়।'

বর্ণ, পদ, বাক্য এবং পদের অর্থ, বাক্যের অর্থ কীভাবে প্রতীত হয় তা নিয়ে প্রচুর ঝগড়াঝাটি আছে দার্শনিকদের মধ্যে এবং সেখানে সংস্কার শব্দটাও মাঝেমাঝেই সাড়ম্বরে উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কার পূর্বজন্মের সংস্কার অথবা সংস্কারজন্য জ্ঞান তথা স্মৃতি — এগুলির পারিভাষিকতা বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে বিভিন্ন রকম। তবে কিনা মানুষের মধ্যে নতুন কোনো ভাব অথবা বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমরা যখন পূর্বজন্মের সংস্কারের কথা বলি, তখনও যেমন সেই মানুষের পূর্বতন জন্মান্তরীণ গুণকে নতুনের উদ্ভাসে দেখতে পাই, তেমনি একই ভাবে পূর্ব-পূর্ব বর্ণ একটি পদের মধ্যে গুণসংযোজনা করতে-করতেই তবে কিনা একটি সম্পূর্ণ পদে পরিণত হয়। দার্শনিক দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের এই কথাটা নিতান্তই অপরিণত এবং বলাৎকৃত বলে

মনে হবে, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখবেন যে, সংস্কার বলতে মূলত পূর্বতন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে নতুন গুণের সংযোজনই বোঝায়। আসলে স্নান করা বা চুল বাঁধার মধ্যে পূর্বতন বস্তুকে যে পুনঃসজ্জীকরণের ব্যাপার আছে। যজ্ঞিবাড়ির পুজোর বাসন মেজে নেবার মধ্যে যে নবীকরণের আভাস আছে। আসনশুদ্ধি বা জলশুদ্ধির মধ্যে যে যোগ্যতা আধানের ব্যাপার আছে, পূর্ব-পূর্বোচ্চারিত বর্ণের সঙ্গে নতুন বর্ণ যোগ করেও কিন্তু সেই পুনঃসঙ্গীকরণ, নবীকরণ বা সম্মিলিত বর্ণের পদ হয়ে ওঠার যোগ্যতাই আমরা বুঝতে পারি। তবু স্বীকার করতে হবে যে, সংস্কারের জন্য স্নান যে বর্ণ-পদের সংস্কার ঘটনাটুকু আমাদের প্রতিপাদ্য সংস্কারের আসল রূপ নয়।

মানুষের জীবন এবং ধর্মচর্যার নিরিখে এখানে সংস্কার বলতে আমরা যা বোঝাতে চাইছি অথবা প্রাচীনেরা সংস্কার বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন মীমাংসাদর্শনের প্রবক্তারা এবং অবশ্যই আরও এক প্রমুখ ব্যক্তি যাঁর নাম শংকরাচার্য। শবরস্বামী জৈমিনিসূত্রে উল্লিখিত সংস্কার শব্দটি অর্থ বোঝানোর জন্য বলেছেন — সংস্কার হল সেইটা, যেটা করা হলে একটি পদার্থ একটি বিশেষ প্রয়োজনের অথবা বিশিষ্ট করণীয় কার্যের যোগ্য হয়ে ওঠে — সংস্কারো নাম স ভবতি, যস্মিন্ জাতে পদার্থো ভবতি যোগ্যঃ কস্যচিদর্থস্য। সত্যি কথা বলতে কি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন এই সংজ্ঞার মধ্যে দার্শনিকতা খুব বেশি নেই।

যজ্ঞক্রিয়ায় ব্যবহার হবে, তেমন জিনিসের ঘষা-মাজার মধ্যেই যেন এই সংস্কারের তাৎপর্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শবরস্বামীর কথার মধ্যে যে গভীর বক্তব্য আছে, সেটা প্রকাশ করে দিয়েছেন তন্ত্রবার্তিকের লেখক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কুমারিল ভট্ট। তাঁর মতে সংস্কারের মাধ্যমে একটি পদার্থ বৃহত্তর প্রয়োজনের যোগ্য হয়ে ওঠে — প্রসঙ্গ শবরস্বামী কথিত ওই যোগ্যতা ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় দুটি উপায়ে — করণীয় বিষয়ে দোষ নষ্ট করে দেয় সংস্কার। অথবা সংস্কার তাতে নতুন গুণের আমদানি করে — যোগ্যতা

চ সর্বত্রৈব দ্বিপ্রকারা দোষাপনয়নেন গুণান্তরোপজননেন বা ভবতি।

কুমারিল ভট্টের এই ভাবনার সঙ্গে একেবারে মিলে যাবে বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ শংকরাচার্যের মত। তিনি তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গীতে মোক্ষের স্বরূপ বোঝাবার সময় বললেন — মোক্ষ যেহেতু স্বয়ং পরব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম, অতএব মোক্ষের কোনো সংস্কার করা সম্ভব নয়। 'সংস্কার' সম্ভব নয় — এই প্রসঙ্গে সংস্কার শব্দটার তাৎপর্য নির্ধারণ করেছেন শংকর। বলেছেন — সংস্কার তাকেই বলে যা দিয়ে সংস্কার্য্য বস্তুর মধ্যে নতুন কোনো গুণের আধান করা যায় অথবা সংস্কার্য্য বস্তুর অন্তর্গত দোষ নষ্ট করে দেওয়া যায়। মোক্ষ ব্যাপারটা ব্রহ্মের মতোই নির্বিকার-স্বরূপ অভিব্যক্ত হবে। ঠিক যেমন ঘর্ষণ ক্রিয়ার সংস্কারে দর্পণের মালিন্য ঘুচে গেলে তবেই তার ভাস্বরত্ব অভিব্যক্ত হয়। এই ব্যাখ্যায় প্রতিপক্ষের যুক্তি থাকলেও ঘর্ষণ-সংস্কারের দ্বারা যে মালিন্যনাশের কথা বললেন শংকর তাতে বেশ বুঝি — সংস্কার মানে গুণসংযোজনা ঘটাতেই হবে এমন কথা নেই, অন্তত দোষাপনয়ন করতে পারলেই সংস্কারের তাৎপর্য সুরক্ষিত হয়। অপিচ ঘর্ষণ-ক্রিয়ায় দর্পণের মালিন্য নাশ হয়ে গেলে ভাস্বরত্ব ধর্মের অভিব্যক্তিও তো একভাবে গুণাধানের কথাটাই পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

তবে একই সঙ্গে সবিনয়ে জানাই, ব্রহ্মতত্ত্ব বা মোক্ষতত্ত্ব নিয়ে আপাতত আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শংকরের কাছ থেকে সংস্কার শব্দের যে অর্থ পাওয়া গেল, সেটি আপ্রবন্ধ আমাদের কাজে লাগবে।

গুণাধানের বা দোষাপনয়ন — এই দুটি যদি সংস্কারের উদ্দেশ্য হয় তবে প্রথমটি বুঝতে আমাদের খুব অসুবিধে হয় না। একজন মানুষ চুল-দাড়ি কেটে স্নান করে নতুন একটা ধুতি পরার পর শরীরে এবং মনে যে সজীবতা অনুভব করে সেটাকে দৃশ্যতই গুণাধান বলা যেতে পারে। একইভাবে যজ্ঞের ব্যবহার্য পাত্র ধুয়ে-মুছে নেওয়া বা চালের ওপর জলের ছিটে দিয়ে প্রোক্ষণ করার মধ্যেও যদি অত্যন্ত লৌকিকভাবে বা

যৌক্তিকভাবে ধুয়ে নেওয়ার প্রতীকী আচরণটাই বুঝি, তাহলেও বলব দৃশ্যতই যেখানে নতুন গুণের সংযোজন ঘটল, কিছু না হোক পরিষ্কার তো হল বটে। কিন্তু সংস্কার যখন দোষ অপনয়নের তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আদিম যুগের দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসের ছোঁয়া পাই। অশরীরী আত্মা, রাক্ষস, পূর্বজন্মের পাপ, সময়ে যে কাজ করা উচিত ছিল, তা না করার দোষ — সবই জুড়ে আছে এই দোষাপনয়নের পরিসরে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির মধ্যে সংস্কারের যে তাৎপর্য বৈদিক যুগ থেকে চালু হয়েছিল সেই তাৎপর্য আরেকভাবে ঢুকে পড়ল সম্পূর্ণ একটি মনুষ্য-জীবনের মধ্যে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তুকে সংস্কারের মাধ্যমে যজ্ঞের উপযুক্ত করে তোলাটা যেমন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমন করেই মানুষের জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাকে দেবভাবের উপযুক্ত করে তোলার জন্য তাঁর জীবনে বিভিন্ন সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বৈদিকেরা।

আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণায় মনে হয় — সংস্কারগুলি সৃষ্টির পিছনে মনস্তত্ত্বের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। গভীর বিশ্বাস সেই মনস্তত্ত্বকে আরও পুষ্ট করেছে। চুল কাটা, নখ কাটা, কী স্নান করার পর শারীরিক মানসিক স্ফূর্তি অবশ্যই আসে; সংস্কার পালনের মাধ্যমে সেই সাধারণ স্ফূর্তি আসে না বটে, তবে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে যে সামাজিক তুষ্টি বা আত্মসচেতনতা তৈরি হয়, হয়তো সেই তুষ্টি এবং সচেতনতা সেকালের মানুষকে এক ধরনের প্রত্যয় দিত। আরও দিত অন্যের তুলনায় বৃহত্তর এবং বিশিষ্ট হওয়ার এক পৃথক আস্বাদ। অবশ্য একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে — ভালো হোক অথবা এখনকার দৃষ্টিতে একেবারে মন্দই হোক মনুষ্যজীবনের এই সংস্কারগুলি কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে সেই সমাজের প্রয়োজন বুঝেই। সে প্রয়োজন এখনকার দিনের প্রয়োজনের সঙ্গে একরকম নয় বলেই আমাদের জানবার দায়িত্ব আসে — কোন্ প্রয়োজনে, কোন্ ভাবনায় এবং কোন্ সামাজিক পরিবেশে আমাদের বহুল আচরিত সংস্কারগুলি জন্ম নিয়েছিল এবং কেনই বা সেগুলি সব টিকে

থাকেনি এবং কেনই বা কিছু এখনও টিকে আছে। যে কটি টিকে আছে তার হিসেব আমরা জানি। সেই অন্নপ্রাশন, উপনয়ন আর বিবাহ। শ্রাদ্ধও টিকে আছে কোনোমতে। তবে কেউ এটাকে সংস্কার বলেন, আবার কেউ বা নয়। তবে এই চারটি বাদ দিলে আর যেগুলি আছে — যেমন গর্ভাধান্ পুংসবন সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, কেশান্ত — এগুলির এখন নামও শোনা যায় না, শব্দার্থবোধ তো দূরের কথা।

ভারতবর্ষীয় সমাজে সংস্কারের সংখ্যা কয়টি, সে প্রশ্নে যাবার-আগে সব চেয়ে বড়ো কথা যেটা আগেই বিশেষভাবে জানানো দরকার, সেটা হল — সেকালের সামাজিক প্রয়োজন এবং বিশ্বাস — এ দুটিরই ভিত্তি ছিল যজ্ঞ। এমনকী গর্ভাধান থেকে উপনয়ন অথবা বিবাহ থেকে অন্ত্যেষ্টি — যেগুলিকে আমরা সাধারণত শরীর-সংস্কার বলি — সেগুলিও তৈরি হয়েছিল যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই। মনু বলেছিলেন — বৈদিক মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে বামুন-ক্ষত্রিয়েরা যেন গর্ভাধান ইত্যাদি শরীর-সংস্কার পালন করেন। তাতে পরকালেও পুণ্যফল লাভ করবে, ইহকালেও শুভ ফল — কার্য্যঃ শরীর-সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ। মনুর মতে যে মানুষ সমস্ত সংস্কার পালন করেছে এবং সংস্কৃত দেহে যাগ-যজ্ঞ করেছে, সে তার ফল পাবে পরকালে — পরলোকে সংস্কৃতস্য যাগাদি-ফল-সম্বন্ধাৎ-আর ইহকালের শুভফল তো একেবারেই স্পষ্ট, উপনয়নাদি সংস্কার হলে বেদপাঠে অধিকার মিলবে — ইহকালে বোদধ্যয়নাধিকারাৎ।

বেশ বোঝা যায় — বেদ এবং যজ্ঞ কর্মকে আবর্তন করেই সংস্কারের জন্ম। শরীরের সংস্কারগুলি সম্বন্ধে প্রথম ভাবনাগুলি যে গ্রন্থের মধ্যে ভাবা হয়েছিল তার নাম গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে সমস্ত সংস্কারগুলির অনুষ্ঠান একাকার হয়ে রয়েছে গৃহস্থের করণীয় নানান যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে। পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ ইত্যাদি গার্হস্থ্য যজ্ঞের এক একটা অঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সংস্কারগুলির এক একটা গুচ্ছ। যেমন ধরুন, পাকযজ্ঞের একটি অংশের নাম 'হুত' — দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনের আহুতি দেওয়া হচ্ছে — এমন হুত-কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে

বিবাহ থেকে সীমন্তোন্নয়ন পর্যন্ত কতগুলি সংস্কার। এই রকমই আরেকটা যজ্ঞাংশের নাম 'প্রহুত' তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতকর্ম থেকে মাথা-ন্যাড়া করার চৌল সংস্কার। আবার উপনয়ন, সমাবর্তনের মতো সংস্কারগুলি উল্লিখিত হচ্ছে 'আহুত' নামক পাকযজ্ঞের মধ্যে। গৃহসূত্রগুলির মধ্যে যজ্ঞ এবং সংস্কারগুলির এই পারস্পরিক মিশ্রচারিতা থেকে এইটুকুই শুধু প্রমাণ হয় না যে, সংস্কারগুলি প্রথম অবস্থায় গার্হস্থ্য যজ্ঞগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মাত্র। গৃহ্যসূত্রগুলি ভালো করে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, সেখানে যজ্ঞগুলির প্রাধান্যই বেশি, সংস্কারগুলি সেখানে ব্যক্তি-গৃহস্থের ইতিকর্তব্যতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, দেবতাদের তুষ্ট করা বা তাঁদের অনুকূলে নিয়ে আসার মধ্যেই যজ্ঞের তাৎপর্য, আর সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য হল একটি ব্যক্তির ব্যাক্তিগত শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ভাবনার জন্য চিহ্নিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে — সে গৃহ্যসূত্রই হোক অথবা শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্রই হোক অথবা শতপথ-ঐতরেয় ইত্যাদি ব্রাহ্মণগ্রন্থ — এ, সব জায়গায় সংস্কারগুলিকে পৃথক একটি বর্গ হিসেবে কখনোই চেনা যায় না। গৌতমের ধর্মসূত্রে অন্তত চল্লিশটা সংস্কারের নাম আছে, কিন্তু সেই সংখ্যার মধ্যে গর্ভাধান সীমন্তোন্নয়ন বা অন্নপ্রাশন-উপনয়নের কথা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অগ্নিহোত্র-অগ্নিষ্টোমের কথা। স্নানও সেখানে একটা সংস্কার, অবার ব্রত নিয়ম-চাতুর্মাস্যও এক একটি সংস্কার। আশ্চর্যের বিষয় হল, অতিরাত্র বা সৌত্রামণি যাগ অথবা বাজপেয় সোমযাগের মতো বিশাল এবং বহুকীর্তিত যজ্ঞকাণ্ডের সঙ্গে যখন অন্নপ্রাশন-নামকরণের মতো গার্হস্থ্য কর্মগুলি একসঙ্গে স্থান পায়, তখন বোঝা যায় যে, অতি-প্রাচীন ভাবনায় অন্নপ্রাশন-উপনয়নের মতো প্রক্রিয়াগুলি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যতটা অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম বা অতিরাত্র-যজ্ঞ।

সময় অতীত হতে থাকলে আস্তে আস্তে কিন্তু এই বোধ তৈরী হতে থাকে যে, দেবতার তুষ্টিসাধক যজ্ঞ ক্রিয়ার সঙ্গে একটি ব্যক্তির জাতকর্ম,

অন্নপ্রাশন বা নামকরণের মতো সংস্কারগুলির একত্র স্থান হওয়া উচিত নয়। কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য দেবতার তুষ্টি এবং মনুষ্যজীবনে তাঁদের আনুকূল্য বিধান। অন্যদিকে সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য হল, মানুষের দেহ এবং মনকে উত্তরোত্তর সংস্কৃত করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করে তোলা। অনেক পরবর্তীকালে হলেও ধর্মশাস্ত্রকারেরা এই পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছিলেন। মনু-মহারাজ যখন লিখেছিলেন-গর্ভাধানাদি সংস্কার এবং বিবিধ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করার ফলে মানুষের শরীর এবং অন্তরাত্মা মোক্ষলাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে — মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ, ঠিক তখনও কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সংস্কারগুলির পার্থক্য তত স্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রকার হারীত অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ এগুলি হল সব দৈব সংস্কার আর জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এগুলি হল ব্রাহ্মসংস্কার। ব্রাহ্মসংস্কারে সংস্কৃত মানুষ ঋষিদের সমানতা লাভ করে। আর দৈব-সংস্কারগুলির মাধ্যমে মানুষ দেবতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে।

হারীত যা বলেছেন, তাতে দুটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত বোঝা যায় যে, একটা সময়ে যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি অবান্তর ক্রিয়া থেকে কতগুলি সংস্কার এক অতি পৃথক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং তাদেরই বর্গীকরণ ঘটেছে সংস্কার বলে। দ্বিতীয়ত এই সংস্কারগুলির সংকলন সময়ে হারীত যখন প্রথমেই বলেন — যে ব্যক্তি গৃহশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী গর্ভাধানে উদ্‌যুক্ত হন, তিনি ব্রহ্মময় গর্ভ আধান করছেন — তখন বোঝা যায়, শুধু যৌন লালসা বা কামনাপূর্তির জন্যই নরনারীর মিলনে উৎসাহ দিচ্ছেন না শাস্ত্রকারেরা। কেননা তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভবিষ্যতে ব্রহ্মভাবনার উপযুক্ত হয়ে উঠবেন যে ব্রাহ্মণ তিনি শুধু একটি সাধারণ মনুষ্য বীজ হিসেবেই স্ত্রীর গর্ভে আহিত হবেন না। সে বীজ মন্ত্র-আচার সহযোগে ব্রহ্মময় হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় সংস্কৃত হয়েই পিতার দ্বারা মাতৃগর্ভে আহিত হবে — গর্ভাধানবদুপগতো ব্রহ্মগর্ভং দধাতি।

সত্যি কথা বলতে কী — হারীতের বলা ব্রাসহ্মসংস্কারগুলি আসলে

ব্রাহ্মণ হওয়ারই সাধন বা সাধনা। মহাভারতে দেখা যাবে — ভরদ্বাজ ভৃগুকে প্রশ্ন করছেন — কী করলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ভৃগু আমাদের এই আলোচ্য সংস্কারগুলির কথাই বলেছেন বটে, কিন্তু সেই সংস্কার-প্রসঙ্গের পূর্বে একটা গৌরচন্দ্রিকা আছে। ভরদ্বাজ যথেষ্ট আধুনিকভাবে প্রশ্ন করে ভৃগুকে বলেছিলেন — দেখুন মহর্ষি! আপনি এই বর্ণভেদ আর জাতিভেদটাকে করছেন কী করে — কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে? কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পরিশ্রম — এ তো আমাদের সকলেরই আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে এগুলি সাধারণ বৃত্তি। তো এই বর্ণভেদ, জাতিভেদ করছেন কেমন করে? এই দেখুন না — ঘর্ম, মূত্র, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, রক্তই — এ তো আমাদের সকলের দেহ থেকেই বেরোয়। তাহলে আবার এমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — এ-সব ভেদ করছেন কেন — কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে?

ভৃগু বললেন — আসলে সত্যিই জাতিভেদ বলে, বর্ণভেদ বলে কিছু নেই। সৃষ্টিকর্তা যখন সৃষ্টির তপস্যায় বসে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন সমস্ত মানুষই ব্রাহ্মণ ছিল — সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। কিন্তু সেই সব মানুষই এমন সব কাজ করতে আরম্ভ করল যে সেই কাজের গতিতেই বর্ণভেদ, জাতিভেদ তৈরি হয়ে গেল — কর্মভি-বর্ণতাং গতম্। সেই পূর্বসৃষ্ট ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাদের স্বভাবটা রুক্ষ, বিষয়ভোগের স্পৃহা যাদের বড়ো বেশি, যারা ক্রোধী এবং সাহসের কাজ করতে পারে অপিচ যাগ-যজ্ঞ, বেদ-পড়া, যজন-যাজন এসব যাদের আর ভালো লাগে না, সেই সব বামুনই ক্ষত্রিয় হয়ে গেল — তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।

একইভাবে যে-সব বামুন বেদাধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞ, শৌচ-আচার ত্যাগ করে পশুপালন আর কৃষিকর্মের মাধ্যমে-জীবিকা নির্বাহ করা আরম্ভ করলেন, তাঁরা বৈশ্যবর্ণে পরিণত হলেন — তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ। আর যে সব বামুন স্বভাবত অলস তমোময়, যারা টাকার জন্য ভালো-মন্দ কোনো কাজই করতে লজ্জা পান না, নিজের প্রয়োজন সাধন করতে যাদের মিথ্যা

বলতেও বাধে না, হিংসে করতেও বাধে না, তারা সব শূদ্র হয়ে গেল — তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।

জন্মের দ্বারা নয়, একটি মানুষ তার জীবনধারণের জন্য কোন্ ধরনের বৃত্তি বেছে নিচ্ছে — সেই কর্মের দ্বারাই সেই মানুষটির বর্ণভেদের ঘটনাটা অনেক বেশি সহনীয় হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে একটা বিপরিণমনের ব্যাপার আছে তার কারণটা সর্বত্রই বলা হয়েছে — সত্য, ধর্ম, তপস্য, বেদ, আচার শৌচ ইত্যাদি সর্বথাসিদ্ধ ব্রাহ্মণোচিত ভাবনার ত্যাগ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ যে বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তা শব্দার্থের ঈষৎ পরিবর্তনেও প্রায় একইরকম — 'ত্যক্তস্বধর্মাঃ স্বধর্মান্নাতিষ্ঠন্তি, শৌচপরিভ্রষ্টাঃ।

পূর্ব-সৃষ্ট একই ব্রাহ্মণ আপন কর্ম এবং জীবিকার গতিকে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হলেন — এই কথাটার সূত্র ধরেই ভরদ্বাজ আবার ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাহলে প্রাথমিক দৃষ্টিতে কীভাবে ব্রাহ্মণকে চেনা যাবে — ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি? ভৃগু বললেন — খুব সোজা। দেখবে — যাদের বাড়িতে শিশুর জন্মের আরম্ভ থেকে তাকে ব্রাহ্মভাবনার উপযুক্ত করে তোলার জন্য জাতকর্মাদি বৈদিক সংস্কার প্রয়োগ করা হয়, যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম ইত্যাদি ছয় প্রকার দৈনন্দিন কর্মে নিবিষ্ট থাকেন, যিনি শুচিতা এবং সদাচার পালন করেন, যিনি যজ্ঞান্তে যজ্ঞশেষ ভোজন করেন এবং যিনি ব্রতনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে চিনবে। ব্রাহ্মণের কর্ম-লক্ষণ বলেই ভৃগু সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন — যিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও উপরিউক্ত কর্মগুলি করেন না, তিনি যেমন ব্রাহ্মণ নন, তেমনি শূদ্রের ঘরে জন্মালেও যিনি উক্ত সদাচারগুলি পালন করেন, তাঁকেও শূদ্র বলা যাবে না।

কোনো সন্দেহ নেই, এগুলি বেশ বৈপ্লবিক কথাবার্তা বটে, কিন্তু কাল অতীত হতে থাকলে এই সব গুণ-কর্মের সংযোগও যেমন একটি শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্ব দিতে পারেনি, তেমনি উপরিউক্ত উক্তি গুণ-কর্মের

অনেকটাই, বিশেষত যাগ-যজ্ঞ, যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, সত্য এবং ত্যাগব্রত ইত্যাদি সমস্ত গম্ভীর এবং কষ্টকর বিষয় থেকে একটু একটু করে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র জাতকর্মাদি সংস্কার আঁকড়ে ধরে রইল, যার রেশ মিলবে এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত। কিন্তু এটাও সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হবে যে, মহাভারতের যুগে যখন প্রাথমিকভাবে জাতকর্মাদি সংস্কারের চিহ্নেই একজন মানুষের ব্রাহ্মণ বলে চিনে নেবার প্রসঙ্গ উঠেছে, তখন কিন্তু এই সংস্কার-পালনের মর্যাদা এবং পরিশ্রমও কিছু কম ছিল না। অন্তত সে যাতে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ব্রহ্মভাবনার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে, সংস্কৃত শরীরকে সে যাতে মানস সংস্কারের কাজে লাগাতে পারে, সেই জন্যই সংস্কারগুলিকে ব্রাহ্মণ-পদবী লাভের উপকারক সাধন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে।

সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য মনুর মতে ব্রাহ্মীভাবনাই হোক, অথবা হারীতের মতে হোক তা ঋষিকল্পতার বাচক, আমাদের বিভিন্ন সংস্কারগুলির প্রক্রিয়া অনুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের বিশ্বাস অবিশ্বাস তথা সামাজিক প্রথা-সৃষ্টির কারণগুলিও বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়বে। দেখা যাবে, কতগুলি সংস্কার সৃষ্টি হয়েছিল একেবারে আদিম ভয়-ভীতি থেকে, কতগুলির পিছনে আছে বর্ণাশ্রমের প্রেক্ষাপটে সামাজিক শ্রেষ্ঠতালাভের অভিলাষ আবার তার মধ্যেও কতগুলির মধ্যে জড়িয়ে আছে ধর্ম এবং আত্মোন্নতির শ্রেয়োভাবনা। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে প্রাদেশিক ভিন্নতা আছে, ব্যাক্তি, সমাজ, আচার-ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যেও যে বিভিন্নতা আছে, সংস্কারগুলির সৃষ্টির পিছনেও সেই বিভিন্নতা আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের এক-এক প্রদেশ এক-একভাবে বৈদিক সংস্কার পালন করে। সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সংস্কার পালনের রীতি-নীতিও এক রকম নয়।

আবার এক বিশাল বিস্তীর্ণ কাল-শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এককালে যে সব সংস্কারকে — যেন ধরুন গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদিকে যেমন মূল্য দেওয়া হত, কালক্রমে সেগুলি উঠেই গেল। উঠে

যেতেই হবে, কেননা সংস্কারের জন্ম সমাজ থেকে। সমাজে সেই জটিলতা এল, বেদ-বিহিত যাগ-যজ্ঞ যখন স্থান পরিবর্তন করে জ্ঞান আর মননকে অশ্রয় করল, ব্রাহ্মণ যখন যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ছাড়াও অন্য কর্মের দিকে নিজেদের দৃষ্টি প্রসারিত করল তখন সংস্কারগুলির মধ্যে বেঁচে রইল শুধু তিনটে। অন্নপ্রাশন উপনয়ন এবং বিবাহ। মরণোত্তর অন্ত্যেষ্টি এবং শ্রাদ্ধকে কেউ সংস্কার বলেন আবার কেউ বা নয়।

অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে — ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞকর্ম, মানুষের বিশ্বাস এবং বাস্তবতা — এই সব কিছু মিলে যে সব সংস্কারের মূল প্রোথিত হয়েছিল, তা মহর্ষি বৈয়াকরণ পতঞ্জলির সময়েই রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পতঞ্জলি প্রায় নিশ্চিতভাবে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক বলে চিহ্নিত। পতঞ্জলি আপন ভাষ্যের মধ্যেই ক্রমিকভাবে লিখেছেন — আমরা পুষ্যমিত্রের রাজ্যে থাকি। এখানেই আমরা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করি, আর পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের যাজন কার্যও করি আমরাই — ইহ বসামঃ। ইহাধীমহে। ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ। শুঙ্গবংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে মৌর্যবংশের শেষ অপ্রতিভ পুরুষ বৃহদ্রথকে বধ করে সিংহাসনে বসেন। পুষ্যমিত্রের ছেলে অগ্নিমিত্র পিতার মৃত্যুর পর ১৪৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন। তাহলে ওই পুষ্যমিত্রের ছত্রিশ বছরের রাজত্বকালের মধ্যেই পরিণতবুদ্ধি পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

আমরা পতঞ্জলির সময়কাল ভালো করে নির্দেশ করছি কারণ, গৃহ্যসূত্র বা ধর্মসূত্রগুলির রচনাকাল সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত নয়। তবে এদের নিশ্চিত না হলেও বিশদভাবে ৬০০ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্রগুলির রচনাকাল নির্দিষ্ট। কিন্তু আমরা বলতে পারি — গৃহ্যসূত্রগুলি সংস্কারের কারণ, প্রয়োজন বা সংজ্ঞা নির্দেশ করতেই পারে, কিন্তু লোকে তা মানত কিনা যে ব্যাপারেও সন্দেহ থাকতে পারে। ঠিক সেইজন্যই মহাভাষ্যের কথা বলছি। ভাষ্যকার তাঁর পস্পশা আহ্নিকের মধ্যেই অন্তত দুটো সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলি লিখেছেন

— সেকালে উপনয়ন সংস্কারের পরেই ব্রাহ্মণরা ব্যাকরণ পড়া আরম্ভ করতেন — পুরকল্পে এতদাসীৎ — সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণাঃ ব্যাকরণং স্মাধীয়তে।

বলা যেতে পারে — উপনয়নের সঙ্গে বেদমাতা গায়ত্রীর যোগ আছে, ধর্মতত্ত্বের যোগ আছে, ব্রহ্মভাবনার যোগ আছে, অতএব উপনয়নের কথাই আলাদা। এর সঙ্গে অন্য কোনো সংস্কারের তুলনা হয় না। ঠিক এইখানেই আমরা পতঞ্জলির সময়ে প্রতিষ্ঠিত আর একটি সংস্কারের কথা বলব — যার নাম 'নামকরণ'। পতঞ্জলি ব্যাকরণ লিখছেন। কেন ব্যাকরণ পড়া উচিত এই ভাবনাতেই তাঁর সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রসারিত। কিন্তু এই গম্ভীর প্রসঙ্গের মধ্যেই তিনি যাজ্ঞিক বৈদিকের উপদেশ স্মরণ করে বলেছেন — যাজ্ঞিকরা বলেন — পুত্রজন্মের দশম দিন অতিক্রান্ত হলেই তার নামকরণ করতে হবে। নামের আদিতে ঘোষবর্ণ থাকবে, মধ্যে অন্তঃস্থবর্ণ থাকবে, নামের আরম্ভে আ, ঐ, ঔ — এইসব বৃদ্ধিজাত বর্ণ থাকবে না। যে নাম পিতা, পিতামহ, এবং প্রপিতামহ — অন্তত এই তিন পুরুষের স্মারক হয় এবং যে নাম শত্রুদের মধ্যে ব্যবহৃত নয়, সেই নাম দিতে হবে নবজাতককে। নামটি এমনতর হলেই জাতক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। পতঞ্জলির বক্তব্য হল — ঘোষবর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ, বৃদ্ধি — এসব জানতে হলে তো ব্যাকরণ জানতে হবে ভালমতো।

ব্যাকরণ আপাতত চুলোয় যাক, পতঞ্জলির এই ভাষ্যের পরে যদি গৃহ্যসূত্রগুলি দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, তাঁর অধিকাংশ ভাবনাই মিলে যাচ্ছে গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানের সঙ্গে। শুধুমাত্র নামকরণের সংস্কারকেই তিনি যে মাহাত্ম্য দিয়ে দেখেছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় যে, পতঞ্জলির সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই গৃহ্যসূত্রে বলা সমস্ত সংস্কারগুলিই তৎকালীন সমাজের ভাবনালোকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলির মর্যাদা এতটাই যে, সেই সব সংস্কারের বোধন এবং আত্মীকরণের জন্য পতঞ্জলি পাণিনির ব্যাকরণ শিখতে বলছেন।

পতঞ্জলির সময়েই সংস্কারগুলি যেখানে এতটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে, সেখানে গুপ্তযুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের রমরমা চলছে, তখন যে

সংস্কারগুলি রীতিমতো উৎসবের রূপ নেবে, তাতে আশ্চর্য কী! এ-বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে বড়ো দলিল হল কালিদাসের রঘুবংশ। অযোধ্যার বিশ্রুতকীর্তি রাজাদের বংশকাহিনী নিয়েই যেহেতু এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে, অতএব রামচন্দ্রের পূর্বজ পিতা-পিতামহদের জন্ম থেকে যৌবনাবধি জীবনচর্যার আদর্শ এখানে মেলে। কালিদাসের মতো মহাকবি যেহেতু রস-অলংকার আর শব্দমন্ত্রে সংসার জয় করেছেন, তাই নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সমাজ-জীবনের প্রচলিত ভাবনাগুলি তাঁর প্রকাশ করার কথা নয়। পদ-পদার্থের অনির্বচনীয় সরসতা সৃষ্টির সময়েও তিনি যদি মানব জীবনের চির পরিচিত কতগুলি আচার-নিয়ম সংস্কারের উল্লেখ করেন, তাহলে উলটো দিকে এটাই বুঝতে হবে যে, সেগুলির অনুল্লেখে কবি আত্মগ্লানি অনুভব করছেন, অথবা সাধারণের বিশ্বাস লঙ্ঘিত হল বলে পীড়িত বোধ করছেন।

আশ্চর্য লাগবে শুনলে যে, মহাকবি কালিদাস তাঁর সহস্রধারা কাব্যময়ী সত্তাকে অতিক্রম করেও গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি বহুতর সংস্কার তিনি রঘুবংশে কখনও সোজাসুজি বলেছেন, কখনও বা শব্দধ্বনিতে ব্যঞ্জিত করেছেন। মহারাজ দিলীপের স্ত্রী সুদক্ষিণা যখন বহুকালপ্রতীক্ষিত গর্ভ ধারণ করলেন, তখন কালিদাস যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করলেন সেটা একেবারেই গৃহ্যসূত্রোক্ত গর্ভাধানের পদান্তরমাত্র। 'আধান' এই বিশেষ্যপদটি ব্যবহার না করে তিনি ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন যে, নরপতি দিলীপের কুলবৃদ্ধির জন্য আহিত গর্ভ ধারণ করলেন — নরপতিকুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী। 'আধান' পর্যায়ী 'আধত্ত' কথাটা শুনেই কিন্তু টীকাকার মল্লিনাথ গর্ভাধানের সেই মন্ত্রটি স্মরণ করেছেন, যা আজকেও একটি পুরোহিত-দর্পণ বা ক্রিয়াকাণ্ডের বইতে পাওয়া যাবে। মল্লিনাথের এই সচেতন গর্ভাধান-মন্ত্র-স্মরণ থেকেই প্রমাণ হয়, কালিদাসও সচেতনভাবেই এই সুপ্রাচীন গর্ভাধান-সংস্কারের কথা স্মরণ করেছেন প্রসঙ্গত।

কথাটা এমন জোর দিয়ে বলতাম না; এমনকি এও বলতে পারতাম

যে, টীকাকারেরা নিজের বুদ্ধি-ভাবনা এবং সংস্কার অনুযায়ী কালিদাসকে নিজের মতোই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বলতে পারছি না এই কারণে যে, সুদক্ষিণার ক্ষেত্রে পরিচিত গর্ভলক্ষণগুলি প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কালিদাস একেবারে পরিষ্কার উচ্চারণ করে বললেন — যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়া/ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীর্ব্যধত্ত সঃ। — অর্থাৎ 'আমার পুত্র হোক' — এই বাসনা যিনি মনে মনে পোষণ করছিলেন, সেই বাসনা অনুযায়ীই তিনি পুংসবন ইত্যাদি স্মার্ত সংস্কার ক্রমিকভাবে একে একে করে গেলেন। পুংসবন শব্দটির সঙ্গে 'আদি' লাগিয়ে, অপিচ 'যথাক্রমং' শব্দটি পরিষ্কার উচ্চারণ করে কালিদাস বুঝিয়ে দিলেন শুধুই পুংসবন সংস্কার নয়, গর্ভস্থ সন্তান অথবা গর্ভিনীর যে যে সংস্কার তৎকালীন সমাজে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেমন 'অনবলোভন' 'সীমন্তোন্নয়ন' ইত্যাদি, তার সবগুলিরই পালনপ্রক্রিয়াটি যে সমাজে অলঙ্ঘনীয় ছিল, তা বুঝিয়ে দিলেন কালিদাস।

গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতির গ্রন্থগুলিতে সন্তান জন্মের আগে কতগুলি পালনীয় সংস্কার আছে আবার পুত্রজন্মের পরেও কতগুলি সংস্কার আছে। দিলীপের পুত্র রঘুর জন্ম বর্ণনার সময়ে কালিদাস প্রথমে নিজের কবিত্বটুকু প্রকাশ করে নিলেন একটি মাত্র ছত্রে। বললেন — অন্তঃপুরচারী যে সংবাদবহ পুরুষ তাঁকে এসে পুত্রজন্মের খবর দিল, তখন তিনটি মাত্র বস্তু ছাড়া আর সব কিছুই তাঁর দান যোগ্য মনে হয়েছিল। ওই বস্তু তিনটি ছিল, মহান ইক্ষ্বাকুবংশের রাজত্বের প্রতীক রাজছত্র, আর দুটি চামর — শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে। রাজা দিলীপ অন্তঃপুরে গিয়ে পুত্রমুখ দর্শন করলেন এবং চাঁদ দেখার পর সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে, তেমনই তাঁর আনন্দও আর বাধ মানল না।

পুত্রমুখ দর্শনের এই আনন্দ-উপভোগ সমাধা করার সঙ্গে সঙ্গেই কালিদাসের মতো মহাকবিও কিন্তু আর সামাজিক বিশ্বাস অতিক্রম করেননি। তিনি সোচ্চারে লিখলেন — ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠ

তপোবন থেকে এসে রাজপুত্রের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করলেন — স জাতকর্মণ্যখিলে তপস্বিনা/তপোবনাদেত্য পুরোধসাকৃতে। কালিদাস এই পরিচিত সংস্কারের নামমাত্র উল্লেখ করেই ছেড়ে দেননি, সঙ্গে সঙ্গে উপমার অঙ্গুলীস্পর্শে সেই পরিচিত সংস্কারের তাৎপর্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসটুকুও তিনি বলে দিলেন। কবি লিখলেন — খনি থেকে মণি বার করে আনলে মণিটি প্রথমে অপরিশীলিত থাকায় নিষ্প্রভ এবং অনুজ্জ্বল থাকে; কিন্তু শাণের ওপর ঘষে ঘষে মণিটি সংস্কার করা হলে সেই মণি যেমন উজ্জ্বল দীপ্র হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই বশিষ্টপ্রযুক্ত মন্ত্রে জাতকর্ম-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দিলীপের পুত্র তেজিষ্ঠ হয়ে উঠলেন — প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভৌ।

শুধু এই জাতকর্মই নয়, একেবারে স্মার্ত বিধি-নিয়ম মেনে কবি কালিদাস রাজপুত্রের নামকরণ সংস্কারের কথাটাও জানাতে ভুললেন না। শুধু অন্নপ্রাশনের কথাটাই যা এখানে উল্লেখ করেননি কালিদাস। সেটা এতটাই প্রচলিত, এতটাই সাধারণ বলে সে সমাজেও প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সংস্কারের উল্লেখ করার প্রয়োজনই বোধ করেননি কবি। কিন্তু মনু যেহেতু সেইকালেই বিধান দিয়েছিলেন যে, ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে ব্রাহ্মণ্যভাবনার সব সংস্কারই পালন করতে হবে, অতএব কুমার রঘুকেও চৌল-সংস্কার, উপনয়ন-সংস্কার, বিদ্যারম্ভ, এমনকী গুরুগৃহে বাসের শেষ পর্বে কেশান্ত-সংস্কারও সম্পন্ন করে তবে বাড়ি ফিরতে দিয়েছিলেন কালিদাস। এই সমস্ত সংস্কার লাভ করার পর পরেই মলমুক্ত সমুজ্জ্বল হীরক খণ্ডের মতো রাজপুত্র কুমার রঘু যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

রামচন্দ্রের জন্মের পূর্বে একমাত্র রঘুর জন্মখণ্ডেই কালিদাস সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ্বাসাভ্যস্ত সংস্কারগুলি একে একে বর্ণনা করার। দশরথের ক্ষেত্রে যেমন অভীপ্সিত পুত্রজন্ম বিলম্বিত হচ্ছিল দিলীপের ক্ষেত্রেও তাই। অতএব রঘুর জন্মোপূর্ব এবং জন্মোত্তর সংস্কার বর্ণনায় কালিদাস কুণ্ঠাবোধ করেননি এবং এই ক্ষেত্রে পরম্পরালব্ধ সংস্কারগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই উল্লেখ করেছেন বলে রাম-লক্ষ্মণ ইত্যাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্মলগ্নে কালিদাস

সামগ্রিকভাবে লিখেছেন — তখনও পর্যন্ত ধাত্রীস্তন্যপায়ী কুমারদের সকলকেই যথাবিহিত নিয়ম অনুসারে সংস্কার লাভ করানো হল — কুমারাঃ কৃতসংস্কারাস্তে ধাত্রীস্তন্যপায়িনঃ।

মল্লিনাথ সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পণীতে বললেন — সমস্ত সংস্কার, মানে জাতকর্মাদি সংস্কার — কৃতাঃ সংস্কারাঃ জাতকর্মাদয়ো যেষাম্।

লক্ষণীয়, এমন কথা যদি বলি যে মহাকবি কালিদাস তাঁর নিজের সময়ের সামাজিক সংস্কার উল্লঙ্ঘন করেননি, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতিভূ — তাহলে ভুল বলা হবে। কালিদাসের এই সাংস্কারিক ভাবনা পূর্বতন মহাকাব্যকারদের সামাজিক পরম্পরাক্রমেই এসেছে। স্বয়ং বাল্মীকিকে দেখুন, দশরথের চার ছেলে জন্মাবার পরে সেখানেও কবিকে লিখতে দেখছি — পুত্রজন্মের পর এগারো দিন গেলে দশরথ রাজকুমারদের নামকরণ করলেন — অতীত্যৈকদশাহন্তু নামকর্ম তথাকরোৎ। তার মানে, বাল্মীকিও তাঁর সময়ের যে সংস্কারটুকু ধরেছেন, তা অবশ্যই গৃহ্যসূত্রে বলা নিয়ম বিধির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অবশ্য অনেক পণ্ডিতের মতেই রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু তাতে কী এলো গেল। যত প্রক্ষিপ্তই হোক, রামায়ণের আদিকাণ্ডের এই অংশ কোনও ভাবেই কালিদাসের পরবর্তী যুগে লেখা নয়। আর শুধু নামকরণ-সংস্কারই নয়, জাতকর্মাদি সমস্ত সংস্কারের কথাই বাল্মীকি জানতেন এবং তা তিনি সাড়ম্বরে আপন সামাজিক বিশ্বাস অনুসারেই লিখে গেছেন — তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ। যদি আদিকবির জবানীতে অবিশ্বাস থাকে, তাহলে ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবন মন্থন করা আর এক অমৃত মহাকাব্যের একটি শ্লোক লক্ষ্য করুন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মের পর কুরুরাজ্যের পালক পুরুষ মহামতি ভীষ্মও কিন্তু সমস্ত স্মার্ত সংস্কারগুলিই প্রয়োগ করেছিলেন। মহাভারতের কবি প্রথমত অস্পষ্টভাবে বলেছিলেন — রাজকুমারদের করণীয় এবং পালনীয় কৃত্যগুলি সম্পন্ন হবার পর সমস্ত পৌরজনপদবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে এ-কথাটা লেখার পরেই মহাভারতের কবির নিশ্চয় মনে

হয়েছে — কলিযুগের লোকেরা যদি ভুল বোঝে। অতএব স্পষ্ট করে লিখে দিলেন — সমস্ত সংস্কারে রাজকুমারদের সংস্কৃত করা হল এবং এই সংস্কারের সাধন হিসেবে যেখানে ব্রতপালনের প্রয়োজন সেখানে ব্রত পালন, তথা যেখানে অধ্যয়নের প্রয়োজন সেখানে অধ্যয়নও করতে হল রাজকুমারদের — সংস্কারৈঃ সংস্কৃতাস্তে তু ব্রতাধ্যয়নসংযুতাঃ। সত্যি কথা বলতে কী, যে সব সংস্কারের পর পৌরজনপদবাসীরা প্রথম রাজকুমারদের দেখে আনন্দিত হয়েছিল, সেগুলি সম্ভবত জন্মের অব্যবহিত পরেই জাতকর্মনামকরণাদির সংস্কার। আর ব্রত এবং অধ্যায়ন শব্দটি সংযুক্ত থাকায় বুঝতে পারি — এগুলি হয়তো চৌল সংস্কার, উপনয়ন সংস্কার ইত্যাদি।

রামায়ণ, মহাভারত, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং বিশেষত কালিদাসের বিবরণ প্রকাশ করে আমরা এটাই প্রমাণ করিতে চাইছি যে, তৎকালীন সমাজেই সংস্কারগুলি মনুষ্যজীবনের সংস্কারক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেটা মধ্যযুগ, তখন সংস্কারগুলির পালনীয়তা প্রায় ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হলেও আনুষ্ঠানিক দিকে এগুলির কিছু বিকৃতি ঘটেছে বলেই মনে হয়। বিশেষত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বের যে-সব সংস্কার, গর্ভাধান, পুংসবন ইত্যাদি, এগুলি খানিকটা পৌরোহিত্যের অভিধানে স্বীকৃত নিয়ম-মাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল অন্যদিকে জন্মের পরের যে-সমস্ত সংস্কার, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি — এগুলির সামাজিক তাৎপর্য বেড়েছে।

সংস্কারগুলির পালনীয়তা সম্বন্ধে সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল — আমরা রামায়ণ, মহাভারত কী কালিদাসের ভাবনায় যেমন সংস্কারগুলিকে মানুষের শারীরিক-মানসিক উৎকর্ষ সাধনের অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত দেখেছি, তেমনিই বহুকাল পরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে আমরা যখন উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মধ্যে এসে পড়েছি, তখনও দেখছি সংস্কারগুলির, বিশেষত জন্মোত্তর সংস্কারগুলির আকর্ষণ

বা উৎকর্ষ কোনোটাই ম্লান হয়ে যায়নি। এমনকি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য এড়িয়ে গিয়ে যেখানে প্রগতিশীলতার রূপান্তর দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও কিন্তু জন্মোত্তর সংস্কারগুলির তাৎপর্য এবং সামাজিক মহিমা ঠিকই রয়ে গেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে দুটি ঐতিহাসিক তথ্য আছে। প্রথম কথাটা হল — ধর্মসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রকারেরা পরিচিত সংস্কারগুলির সম্বন্ধে যে শাসন-নিয়ম তৈরি করেছিলেন, ঠিক তেমন করে না হলেও সংস্কারগুলি কোনো-না-কোনোভাবে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে এসেছে এবং তা চলে এসেছে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী নানা উপাসক সম্প্রদায়ের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে। আর দ্বিতীয় কথাটা হল — রবীন্দ্রনাথ 'জাতকর্ম' থেকে জন্মোত্তর সংস্কারগুলির কথাই শুধু বলেছেন, জন্মপূর্ব গর্ভাধানাদি সংস্কার সম্বন্ধে তিনি একেবারেই চুপচাপ। আজও আমরা প্রায় একই রকম চিত্র পাই। সন্তানের জন্ম পূর্বকালে একমাত্র স্ত্রী-আচার সমন্বিত সাধভক্ষণ ছাড়া যা কিছুই আজকে দেখি তা সবই জন্মোত্তর সংস্কার। তাও জাতকর্ম বলে এখন কিছু হয় না। শঙ্খধ্বনির মতো মাঙ্গলিক শব্দ অথবা দেবতার থানে পুজো দেওয়া ছাড়া সন্তানের জন্মকালীন কোনো স্মার্তক্রিয়া আজকাল হয় না এবং সেটাই হয়তো স্বাভাবিক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জাতকর্মাদি ক্রিয়া কীভাবে করিয়েছিলেন সেটা আমার জানা না থাকলেও যে তথ্য আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল — সন্তানের জন্মপূর্বকালীন গর্ভাধানাদি সংস্কার অনেককাল আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে এবং যাও বা সংস্কারাবশেষ টিকে আছে, তাও যে বিভিন্ন ধর্ম এবং উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে হাত মিলিয়েই টিকে আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে একাদশ খ্রিস্টাব্দে

উদয়নাচার্যের লেখা ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন — বেদ অথবা বৈদিক রীতিনীতি-সম্বন্ধী কার্যপ্রবাহের যে উচ্ছেদ ঘনিয়ে আসছে তা অনুমান করা যায় বৈদিক ভাবনায় ভাবিত কতগুলি নিমিত্ত থেকে। যেমন আগে যেভাবে জন্ম হত, যেভাবে সংস্কার হত, বিদ্যালাভের ক্ষমতা যত ছিল, যত আত্মশক্তি ছিল, বেদপাঠ এবং যাগযজ্ঞাদি করার যত অভিজ্ঞতা ছিল — এই সবগুলিই কালস্পর্শে যেভাবে অবক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাতেই বেদ এবং বৈদিক কার্যপ্রবাহের ক্ষয় অনুমান করা যায়।

কথাটা বিশদভাবে বোঝানোর সময় উদয়নাচার্যের মতো বিশাল নৈয়ায়িক তাঁর আপন সময়ের সামাজিক অবক্ষয় তথা সংস্কারের অবক্ষয়ের কথা বলেছেন, যা ইতিহাসের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হতে পারে। উদয়ন বলেছেন — আগে সেই দিন ছিল, যখন একটি সুসংস্কৃত পুত্রলাভের জন্য মুনিঋষিরা যজ্ঞে পুরোডাশাদি আহুতি দিয়ে চরুপাক করে যজমানপত্নীর সন্তানসম্ভাবনা ঘটাতেন। তারপর পুত্রেষ্টি ইত্যাদি সম্ভাবনাময় যাগাদির মাধ্যমে আপন আপন স্ত্রীর গর্ভেই এই সন্তান সম্ভাবনা করা হত। তারপরে সময় আসল, যখন মন্ত্রপূর্বক গর্ভাধান করে উপযুক্ত সন্তান সম্ভাবনা করতেন প্রাচীনেরা। কিন্তু এখন যা হয় — উদয়নাচার্য খেদ করে বলছেন — এখন যা হয়, সন্তানজন্মের পর সংস্কারকার্য আরম্ভ হয় এবং তাও হয় লোকপ্রচলিত আচার-ব্যবহার অনুসারে, নির্দিষ্ট বৈদিক রীতিনীতি অনুসারে নয়। তাহলে কী দাঁড়াল — রবীন্দ্রনাথ যেমন জাতকর্ম থেকে সংস্কারের কথা বলেছেন এবং সেটাও তাঁদের স্বগৃহলালিত ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে, তেমনি নিশ্চয় একাদশ শতাব্দের বহু আগেই গর্ভাধানাদি জন্মপূর্ব সংস্কার উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং যা টিকে ছিল, তা জন্মোত্তরীয় জাতকর্মাদি সংস্কার। অপিচ সেগুলিও লৌকিক ধর্ম এবং লৌকিক ব্যবহারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই ঠিক ছিল। এর সব বড়ো উদাহরণ পাওয়া যাবে প্রচলিত ষষ্ঠীপুজোর মধ্যে। জাতকর্ম বলতে বৈদিক গৃহ্যসূত্রগুলি যা বুঝিয়েছে অথবা মনু-যজ্ঞবাল্ক্যের মতো ধর্মশাস্ত্রকারেরা যা বুঝিয়েছেন, ষষ্ঠীপুজো তার ধারে কাছে আসে না। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিশালবুদ্ধি স্মার্তকে দেখুন।

তিনি সন্তান-জন্মের ষষ্ঠী দিনে সূতিকা ষষ্ঠীপূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর কৃত্যতত্ত্বে। নিকষ কালো একটি ধেড়ে ইঁদুরের ওপর বসে, বনভূমিতে বট গাছের তলায় 'বট বিটপ বিলাসা' শিশুপালিকা এই ষষ্ঠীদেবীর পুজোতেই এখনও অনেক বাঙালি-ঘরের জাতকর্ম সংস্কার সম্পন্ন হয়। লৌকিক ধর্ম-ব্যবহারের সঙ্গে হাত মিলিয়েই অনেক বৈদিক সংস্কারকে অবক্ষীণ শরীরে এইভাবেই টিকে থাকতে হয়।

বৈদিক যুগের আরম্ভ-সময়ে সংস্কারের সংখ্যা কতগুলি ছিল, সে বিষয়ে কৌতূহল হতেই পারে। অতিপ্রাচীন গৌতমের মতে সেই সংখ্যা চল্লিশটি — চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ অষ্টৌ চাত্মগুণাঃ। আগেই বলেছি গৌতম নানবিধ গার্হস্থ্য যজ্ঞ ক্রিয়ার অন্তরে সংস্কারগুলিকে নির্দেশ করেছেন এবং তার তাৎপর্য অত্যন্ত বিশদ বলেই সংস্কারের সংখ্যাটা চল্লিশে গিয়ে ঠেকেছে। বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং বৈদিককালের লৌকিক ব্রত-নিয়ম কীভাবে সংস্কারগুলির সঙ্গে মিশে একত্রে অবস্থিতি করছিল, তা গৌতমের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। এই তালিকায় প্রথম আটটি — গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল এবং উপনয়ন (মোট আটটি) — এগুলি অন্যান্য শাস্ত্রকার বা স্মার্তদের সঙ্গে মিলবে। কিন্তু এরই সঙ্গে যেগুলিকে সংস্কার বলা হয়েছে, সেগুলির নাম হল — বেদব্রত-চতুষ্টয় (আট আর চারে বারো) স্নান (সমাবর্তন স্নান)। সহধর্মচারিণী-সংযোগ অর্থাৎ বিবাহ, তার মানে মোট চোদ্দোটা সংস্কার।

এগুলিকেও সংস্কার হিসেবে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু এর পরে যেগুলি আছে — যেমন পঞ্চ মহাযজ্ঞ (বেদযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ) সাত-রকমের পাকযজ্ঞ, (অষ্টকা, পার্বণস্থালীপাক, শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, আগ্রহায়নী, চৈত্রী এবং আশ্বযুজী)। এর সঙ্গে আছে অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি সাত-রকমের হবির্যজ্ঞ। আরও আশ্চর্য হল, ক্ষত্রিয়দের করণীয় অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, ষোড়শী, বাজপেয় ইত্যাদি সাত রকমের সোমসংস্থাকেও সংস্কারের মধ্যে ধরা হয়েছে। ভাবে বুঝি, রাজারাজড়াদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে ভাবিত করাটাও ধর্মসূত্রকারেরা পরম

কর্তব্য বলে মনে করেছেন। এই সবগুলি মিলিয়ে মোট চল্লিশটি সংস্কারের কথা গৌতম বলেছেন।

আগেই বলেছি, গৌতম নানাবিধ গার্হস্থ্য যজ্ঞক্রিয়ার অন্তরে সংস্কারগুলিকে নির্দেশ করেছেন, ফলত সংস্কারের সংখ্যাটা সেখানে দাঁড়িয়েছে আটচল্লিশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন সংস্কারগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা শুরু হয়েছে, তখনই কিন্তু সংস্কারের সংখ্যা হল তেরোটি। যথাক্রমে — (১) গর্ভাধান; (২) পুংসবন; (৩) সীমন্তোন্নয়ন; (৪) জাতকর্ম; (৫) নামধেয়; (৬) নিষ্ক্রমণ; (৭) অন্নপ্রাশন; (৮) চূড়াকরণ; (৯) উপনয়ন; (১০) কেশান্ত; (১১) সমাবর্তন; (১২) বিবাহ; (১৩) শ্মশান। পরবর্তীকালের বিভিন্ন স্মৃতিতে এই সংখ্যা একটু কমে কখনও বারো বা দশটি হয়েছে আবার কখনও বা বেড়ে ষোলোটাও হয়েছে; এই ষোলোর মধ্যে আবার একজন স্মার্ত যে সংস্কারটি উল্লেখ করেছেন, অন্যজন তা বদলে অন্য একটির উল্লেখ করেছেন, এমন ঘটনাও আছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা হল, মনুষ্য-জীবনের মরণ-শেষের শ্মশানক্রিয়া বা শ্রাদ্ধকে কেউ সংস্কারের মধ্যে ধরেছেন, আবার কেউ বা ধরেননি। মহর্ষি গৌতমের সেই অত বড়ো লম্বা আটচল্লিশের লিস্টির মধ্যেও মানুষের অন্তিম সংস্কার শ্মশানক্রিয়া বা শ্রাদ্ধের কথা নেই, এমনকী গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্র এবং নামীদামী স্মৃতিগ্রন্থগুলির অনেকগুলিতেই আমাদের অতিপ্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়ার কথা নেই। হয়তো এমন হতে পারে যে, অন্যান্য সংস্কারগুলি যেহেতু জীবন্ত মানুষের জীবনের সঙ্গেই জড়িত, অতএব সেগুলির সঙ্গে একত্রে জীবনের অন্ত্যকর্মের স্থান হয়নি। আবার এমনও হতে পারে, মনুষ্যজীবনের সঙ্গে জড়িত সব সংস্কারগুলিই যেহেতু শুভসূচক, তাই অশুভ মরণের সংস্কার — অন্ত্যেষ্টি বা শ্রাদ্ধ — একত্রে স্থান পায়নি অন্নপ্রাশন অথবা উপনয়ন-বিবাহের মতো সংস্কারগুলির সঙ্গে। তবুও কিছু কিছু গৃহ্যসূত্র এবং বিশেষত মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের মতো স্মার্তরা শ্মশান বা শ্রাদ্ধকে সংস্কারের মধ্যে ফেলেছেন বলে পরবর্তীকালে এটিও সংস্কার হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ শোভন পাত্র

কেন গড়ে উঠেছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার? হারিয়ে যাওয়া আচার বিচার বর্তমান জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার গভীর র বিশ্লেষণ ও সঙ্গে বুদ্ধিদৃপ্ত রসিকতায় তৃপ্ত হবেন পাঠক।